দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ২০ সংখ্যা || ১২ জানুয়ারি ২০১৫ || ২৭ পৌষ - ১৪২১ || website : www.eswastika.com

নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত
সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার

........পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২৭ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১২ জানুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

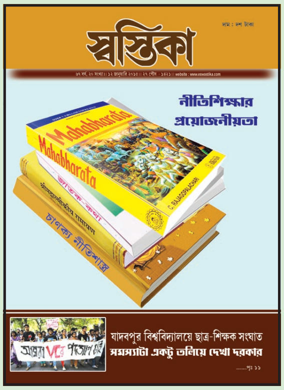

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : বিন তুঘলককে বাংলার চ্যালেঞ্জ
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

গুণ্ডাদের নিয়ে রাজনীতির ফল : সি পি এম ভুগছে, একই অবস্থা হবে তৃণমূলের ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত, সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১১

প্রেরণাদায়ী ঘটনা স্কুল পাঠ্যসূচিতে রাখা দরকার
▯ প্রবীর ঘোষ ▯ ১৩

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
▯ ড: সর্বাণী চক্রবর্তী ▯ ১৬

জাতীয় চরিত্র গঠনে নীতি ও ইতিহাস শিক্ষা আবশ্যক
▯ সমর কুমার বোস ▯ ১৭

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন
▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ২১

পৌরাণিক নগর রাজগৃহ ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২৩

অপ্রাসঙ্গিক আইনকে বিদায় নিতে হবে
▯ মুজফ্‌ফর হোসেন ▯ ২৭

বঙ্গ রাজনীতিতে মমতার দুঃসময় ▯ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৯

অসমে জনজাতি হত্যা ষড়যন্ত্রের গভীরে খৃস্টান সংগঠন
▯ হরিমোহন দাস ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭**▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০**
▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৯ জানুয়ারি
২০১৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৯ জানুয়ারি
২০১৫

ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে এদেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন-এ ভূষিত করে দেশবাসী আজ গৌরববোধ করছে। তাঁর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে কেন্দ্র সরকার সুশাসন দিবস হিসাবে প্রতিবছর পালন করবে বলে স্থির করেছে। এমন এক ব্যক্তিত্বকে নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ— **ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী। লিখেছেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগল কিশোর জৈথলিয়া, অশোক ট্যান্ডন, আনন্দ মিশ্র প্রমুখ।**

আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে 'প্রজাতন্ত্র' সংখ্যা হিসাবে। গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসাবে থাকবে '**সার্ধশতবর্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়**'।

মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ দু'টি সংখ্যাই সংরক্ষণযোগ্য। সত্বর কপি বুক করুন। দাম ১০ টাকাই থাকছে।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

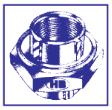

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিদ্যাস্থানে শনি দৃষ্টি

পশ্চিমবঙ্গকে ব্যর্থ রাজ্য হিসেবে আখ্যা দিয়াছেন পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ। যে রাজ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্পে অন্ধকার চলিতেছে তাহাকে ব্যর্থ রাজ্য বলা অমূলক নহে। এই রাজ্যের মানুষ অন্তহীন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নের ফসল পরিবর্তন। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঢাকঢোল পিটাইয়া শুরু হইলেও কাজের কাজ কিছু হয় নাই। তৃণমূল সরকার নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াইয়া বাহবা দিলেও পরিবর্তনের নিটফল হইল শূন্য। ইতিহাসে বাংলাকে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা হইতে জননির্বাচিত রাজা গোপাল স্বাভাবিক শাসনতন্ত্রে লইয়া আসিয়াছিলেন। আমরা মনে হয়, পুনরায় তেমনই এক পরিস্থিতির মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হইতে চলিয়াছি। এখন যাহা চলিতেছে তাহার রূপ হইল দলতন্ত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে স্তাবকের সন্ধানে এই সরকার। রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই স্তাবকবৃন্দ মঞ্চ আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বাম আমলের ন্যায় এই আমলও চলিতেছে স্তাবক সমন্বয়ে। ইহার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে কবেই শিক্ষা নামক বস্তুটি বিদায় লইয়াছে। পরিবর্তনের পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন না হইবার ফলে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র মারামারি লাঠালাঠি চলিতেছে। কোথাও অধ্যক্ষ মার খাইতেছেন, কোথাও আবার শিক্ষকেরা অত্যাচারিত হইতেছেন পুত্রতুল্য ছাত্রছাত্রীদের নিকট। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কন্যাতুল্য ছাত্রীরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলিয়া থানায় ডাইরিও করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের যে পরম্পরা ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক তাহা দলাদলির জন্যই আজ কলঙ্কিত হইয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে রাজনীতিকে দূরে রাখিবার যে সঙ্কল্প একদিন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হইয়া তিনি সেই সঙ্কল্প ভুলিয়া প্রকৃতপক্ষে একদল লুম্পেন দলীয় কর্মীদের হাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লালন পালন করিবার দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছেন। ইহার ফল হইতেছে বিষবৎ। বরঞ্চ বাম আমল হইতেও খারাপ পরিস্থিতি এখন শিক্ষা প্রাঙ্গণগুলিতে। ডাক্তারির ছাত্ররা মানুষ খুনে অভিযুক্ত হইতেছেন, অথচ কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ। কাহারাও কোনো দায় নাই, দায়িত্বও নাই। যে ছাত্র শিক্ষক ছিল গুরুশিষ্য সম্পর্ক আজ তাহারা পরস্পর লড়াইতে ব্যস্ত। বিকাশ সিংহ এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন, বাংলাতে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকাই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াও তাঁহারা আসলে রাজনৈতিক দলের দাদা।' শিক্ষকেরা দাদা হইবার ফলে তাহারা এখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। আজ শিক্ষকের বিপুল বেতন বাড়িয়াছে কিন্তু সম্মান নষ্ট হইয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন থাকিত তবে নিশ্চয়ই উপাচার্য তাহাদের পদসেবকই হইতেন। কিছুকাল পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতম রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ছাত্রদের বলিয়াছিলেন— 'কোনো রাজনৈতিক নেতা, কোনো কর্পোরেট কর্তা এমনকী কোনো ধর্মীয় নেতাদের উপর যেন তাঁহারা নির্ভর না করেন, তাঁহারা যেন চালিত হন সৎ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা।' ছাত্রদের পড়াশোনাই হইল তপস্যা। রাজনীতি সেই তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে না তপস্যা ভুলিয়া ছাত্ররা রাজনীতিতে মাতিয়াছে— তাহা লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে, কিন্তু যাহা চলিতেছে তাহাতে ক্ষতি হইতেছে ছাত্রদেরই। শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে তাই সঠিক কথাটিই বলিয়াছেন— এখনকার যুব সমাজকে বুঝিতে হইবে একবিংশ শতাব্দীতে শুধু আন্দোলন এই প্রতিযোগিতার বাজারে তাঁহাদের আগাইয়া লইয়া যাইবে না। অবশ্য অমর্ত্য সেনও বলিতেছেন একই কথা, 'বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বেশি জাগ্রত করিবার কাজটিও বিদ্যাচর্চার মধ্যেই পড়ে।' কিন্তু কে কাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে! ছাত্ররা নির্বোধের মতো কাজ করিতেছে এবং শিক্ষকেরাও লাজলজ্জা ভুলিয়া নির্লজ্জের মতো আচরণ করিতেছেন। শিক্ষা প্রাঙ্গণ হইতে দলদাসত্ব নির্মূল করিতে না পারিলে এই রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নহে। বস্তুত শিক্ষাপ্রাঙ্গণ হইতে তৃণমূল সরকার যে রাজনীতি মুক্ত করিতে পারিবে না তাহা নিশ্চিত। কারণ এই দল পূর্বে অনিলায়নের বিরোধিতা করিলেও এখন একই পথ মমতায়ন করিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং শিক্ষাপ্রাঙ্গণ হইতে এই জঞ্জাল মুক্ত করিতে নিরপেক্ষ ছাত্রশিক্ষকদেরই দায়িত্ব লইতে হইবে।

সুভাষিত

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ বা তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংস।। (চাণক্যনীতি)

কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণখচিত হয়, তার চরণ দু'টি যদি মণিমাণিক্যখচিত হয়, এক একটি পালকে যদি গজমুক্তা থাকে, তবু কাক কখনো রাজহংস হতে পারে না।

বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি বিজেপি প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসন্ন সব ষড়যন্ত্রের অবসান হবে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথাগত রায়কে সামনে পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ উগরে দিলেন পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও ভক্তগণ। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যারা হামলা করে, বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে, মন্দিরে হামলা ও বিগ্রহ

বাংলাদেশে পূজা পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তথাগত রায়, ডা: সুভাষ সরকার প্রমুখ।

ভেঙে দেয়, মন্দির ও শ্মশানের সম্পত্তি জবরদখল করে, ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত হতে হিন্দুদের বাধ্য করে— তারাই বাংলাদেশ সরকারের কঠোর ব্যবস্থার মুখে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা পায়। বিশেষ করে সাতক্ষীরা ও সংলগ্ন সীমান্ত জেলাগুলো থেকে জামায়াত ও ধর্মান্ধ দলগুলোর নেতারা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে। নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই নিরাপদ আশ্রয়ের ফলে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা ও সম্পত্তি গ্রাসের ঘটনা বাড়ছে। এই দেশেরই লোক, যারা দেশভাগের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক হামলার মুখে বাড়িঘর ও জায়গাজমি ফেলে ভারতে চলে গিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দল ও সরকারে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন তাঁরা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা হলে চুপ করে থাকেন, সামান্যতম উদ্বেগও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এটা এদেশের ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এক ধরনের সহায়তা করে ও উস্কানি দেয়। এই রাজনীতি বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে।

তথাগতবাবুর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র সহ-সভাপতি ডাঃ সুভাষ সরকার, বিজেপি-র কেন্দ্রীয় গবেষণা শাখার সদস্য ধনঞ্জয় কুমার সিং ও পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ মোর্চার সভাপতি সাক্ষীগোপাল ঘোষ। গত ৩ জানুয়ারি মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর তাঁরা বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ হিন্দু- বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও মন্দিরে আগত ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিজেপি নেতৃবৃন্দ বেদান্ত সংস্কৃতি মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের পূজা পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা এসেছেন। ২ জানুয়ারি এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

তথাগত রায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বলেন, তাঁরা বাংলাদেশের সংখ্যলঘুদের সমস্যা জানেন। ঐক্যবদ্ধভাবে এদেশের হিন্দুদেরই তা মোকাবিলা করতে হবে। ‘আমি ঢাকা আসার পর বাংলাদেশে জামায়াতের কাছে সারদার টাকা আসা থেকে শুরু করে হিন্দুদের ওপর হামলা করে ওপারে গিয়ে সরকারের আশ্রয়ে বহাল তবিয়তে থাকা সবই শুনছি। হামলাকারীদের সহায়তাদানকারী রাজনৈতিক শক্তির দিন ফুরিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন অত্যাসন্ন। নিশ্চিন্ত থাকুন, এই পরিবর্তনই এই ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাবে।’ তিনি আওয়ামি লিগ সরকারের ওপর, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকন্যার ওপর ভরসা রাখার জন্যে হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারা ব্যাপকভাবে কাজ করছে। এই ধারা নির্মূল করতে হিন্দুদের আওয়ামি লিগের পাশে শক্তহাতে দাঁড়াতে হবে। তথাগতবাবু বলেন, ‘ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলা থেকে যারা সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে কলকাতায় পালিয়ে গেছেন এবং সরকারে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ‘বিপন্ন অবস্থার’ জন্য দায়ী। সাহস থাকে এখানে এসে বাড়িভিটা উদ্ধার করে রাজনীতি করুন। এ প্রসঙ্গে হিন্দু নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৯০ সালে এরশাদের আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যখন নির্বিচারে হামলা চলছিল, বাড়িঘর- দোকানপাটে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছিল, মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছিল এবং মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটা উক্তি হামলাকারীদের আরও উস্কে দেয়। জ্যোতিবাবু বলেন, ‘বাংলাদেশে কোনো হামলা হচ্ছে না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ।’ এরশাদ সরকার জ্যোতিবাবুর এই বিবৃতিটি সব সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপতে বাধ্য করে। তখন হিন্দুরা দেশত্যাগ

করছিল দলে দলে। সম্ভ্রম বাঁচাতে মেয়েদের নিয়ে অনেকে পালিয়ে বেড়ান। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মূর্তি গুড়িয়ে দেওয়ার পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই হামলায় দেশের প্রায় আড়াই হাজার মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের মধ্যে সামান্যতম উদ্বেগও দেখা যায়নি। প্যালেস্টাইনিদের ওপর হামলা হলে তারা মিছিল করেন। মতবিনিময় সভায় হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকেশ্বরীর সেবায়েত প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, আইনজীবী রাণা দাশগুপ্ত, বাসুদেব ধর, কাজল দেবনাথ, আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, শচীন কর্মকার, তাপস কুমার পাল প্রমুখ। সভায় ঢাকেশ্বরীর ২০ বিঘা জমির মধ্যে ১৩ বিঘা বেদখল হয়ে যাওয়ার কথা বিজেপি নেতৃবৃন্দকে জানানো হয়।

এর আগের দিন ২ জানুয়ারি বেদান্ত সংস্কৃতি মঞ্চের অনুষ্ঠানে তথাগত রায় বলেন, আওয়ামি লিগ সরকারের ওপর ভারতের পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের একজোট হয়ে আওয়ামি লিগকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে এটা বলতে পারি না। আমরা একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। তবে বাংলাদেশের বিষয়টি ভিন্ন। ভারত সরকার উপলব্ধি করেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার চেয়ে ভালো কোনো সরকার বাংলাদেশে হতে পারে না। এখানকার হিন্দুদের জন্যেও এর চেয়ে ভালো সরকার হতে পারে না।

তথাগত রায় একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন, ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন হিন্দু ও ২০ জন মুসলমান ছিল। কিন্তু এখন হিন্দু ৭২ জন, মুসলমান ২৮ জন। বাংলাদেশে হিন্দু কমার কারণ আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেন? এর কারণ, অনুপ্রবেশ ও হিন্দুদের কম প্রজনন। তাঁর আশঙ্কা, একদিন বাঙালি হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, বাংলাদেশের প্রাপ্য ভারত অবশ্যই বুঝিয়ে দেবে। তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তি হবে, নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি। তবে বাংলাদেশ কী পরিমাণ জল পাবে সেটা আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের সাংসদ ও আওয়ামি লিগের উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, আমি বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক দল মনে করি না। বিজেপি নেতৃবৃন্দ ৪ জানুয়ারি আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও বর্তমান মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ৩ জানুয়ারি রাতে তথাগতবাবুর সঙ্গে দেখা করেন।

দেশে ফিরে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ডাঃ সুভাষ সরকার জানান, সফরের প্রথম দিনে ঢাকার পূজা পুনর্মিলন আয়োজিত 'বিশ্বজুড়ে বিশ্বময়ী' আলোচনা সভায় উঠে আসে বাংলাদেশের হিন্দুদের মনোবেদনা। তাঁরা জানান, সামাজিকভাবে তাঁরা নানা ভেদবুদ্ধির শিকার হচ্ছেন। সরকারি চাকুরিতে ন্যায্য অধিকারও পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈনিকদের স্মৃতিতে শহিদস্তম্ভ নির্মাণের দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন। ∎

নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল প্রকাশ করতে আর এস এস-এর শরণাপন্ন হলেন নেতাজীর আত্মীয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ও পরবর্তীকালে তাঁর বিদেশে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজকে গোপনীয়তামুক্ত করার আর্জি জানিয়ে তাঁর আত্মীয়রা আর এস এস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ। নেতাজী পরিবারের সদস্য তাঁর এক ভাইঝি চিত্রা ঘোষ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ড. ডি এন বোস গত শনিবার কলকাতায় আসা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা ইন্দ্রেশ কুমারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নেতাজী সংক্রান্ত ফাইলগুলিকে গোপনীয়তা মুক্তি করার ক্ষেত্রে তাঁকে সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ জানান।

বসু পরিবারের মুখপাত্র চন্দ্র কুমারের বয়ান অনুযায়ী সঙ্ঘ পদাধিকারী ইন্দ্রেশকুমারের সঙ্গে অত্যন্ত সদর্থক আলোচনা হয়েছে। শ্রীকুমার বিষয়টি সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে উত্থাপিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী যতদিন ভারত সরকার তাদের নিজেদের হাতে থাকা ফাইলগুলিকে গোপনীয়তার আওতায় রাখবে ততোদিন অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলিও তারাও কিছুতেই প্রকাশ করবে না। এই মর্মে ২০১২ সালে প্রকাশিত সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী অনুজ ধরের লেখা বিস্ফোরক গ্রন্থ 'India's biggest cover-up' প্রকাশ হবার পরই নতুন করে নেতাজী রহস্য উন্মোচন নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। ধরেই নেওয়া হয় মোদী সরকার ক্ষমতায় এলে আর এস এস-এ বিষয়টি যথাস্থানে তুলে ধরবে। সকলেই জানেন ইংরেজ সরকারের বন্দী হিসেবে গৃহান্তরীণ থাকা অবস্থায় ১৯৪১ সালে তাঁর দেশ স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষায় জীবন বিপন্ন করে নানা মহাদেশব্যাপী যাত্রা ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অমিত বিক্রমের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মকে আদৌ জানতেই দেওয়া হয়নি। নেতাজী পরিবারের সদস্যরা তাই সঠিক সত্য সামনে আনার ক্ষেত্রে আর এস এস-এর ওপরই শেষাবধি ভরসা রাখছেন। ∎

বি এস এফ-কে কারিগরি নজরদারির ক্ষমতা দিতে পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তান থেকে আসা মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ঠেকাতে পাঞ্জাবে বি এস এফের হাতে কারিগরি নজরদারির ক্ষমতা দিতে পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, পাঞ্জাব সীমান্তের ৩৩টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে পাকিস্তানের মোবাইল ফোনের 'সিগন্যাল' পাওয়া যায়। ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের চোরাকারবারিরাই এর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিচ্ছে। পাকিস্তানের মোবাইলে এই নথিভুক্ত 'সিম' কার্ডগুলির মাধ্যমে যে কথোপকথন হয় তা জানতে পারে না ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। এই পরিস্থিতিতে বি এস এফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানায় 'সিন্থেটিক মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা' পাঞ্জাবে মাদক-অপরাধের ঘটনাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। এমনকী বি এস এফ-ও জানিয়েছে যে, সীমান্তের অনেক গ্রামবাসীরই বংশানুক্রমিক জীবিকা হলো এই মাদক-চোরাচালান। বি এস এফ সূত্রের খবর, চোরাচালান কারবারে মাদক-দ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা এই ব্যবসাকে আরও উৎসাহিত করছে। এর ওপরে মোবাইলে যোগাযোগ অনেক সহজতর হচ্ছে বলে ব্যবসায়িক চুক্তিও দ্রুত সেরে নিতে পারছে চোরাকারবারীরা। এরা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনো দেশের 'সিম' কার্ড ব্যবহার করে এই পুরো অপরাধচক্রকে চালাচ্ছে।

সারাদেশ থেকে এই বছর বি এস এফ প্রায় ৩২৪ কিলোগ্রামের মতো হেরোইন উদ্ধার করেছে। অন্যদিকে স্রেফ পাঞ্জাব থেকে অন্য সরকারি সংস্থাগুলি যেমন ডি আর আই, কাস্টমস, নারকোটিক্স ব্যুরো, পাঞ্জাব পুলিশ এবং রাজ্যের বিশেষ অপারেশন সেল মিলে ৩৮৪ কিলোগ্রাম ওই মাদকদ্রব্যটি উদ্ধার করতে পেরেছে। বি এস এফের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের হাতে এই মাদক চোরাচালান রুখতে লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিশেষ নজরদারি যান সবই রয়েছে কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে যে আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা রয়েছে তার তুলনায় এটা নিতান্তই অপ্রতুল। সূত্রের খবর, ডি আর আই এবং রাজ্য পুলিশের মতো সংস্থাগুলির হাতে সীমান্ত এলাকায় কারিগরি নজরদারির ক্ষমতা থাকায় সেখানে মাদক-চোরাচালান ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের খবর তাদের হাতে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। যেখানে বি এস এফ-কে গুপ্তচরদের ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে। কিন্তু সেখান থেকেও খবর সেভাবে মিলছে না মূলত গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংযোগের অভাবেই।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই চোরাচালানের সঙ্গে বিএসএফ জড়িত বলে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক-মহলের একাংশ যে দাবি করেছেন তা আদপেই ভিত্তিহীন। গত তিন বছরে মাত্র তিনজন বি এস এফ কনস্টেবল ধরা পড়েছে চোরাচালানকারীদের অন্যায্য সুবিধে দেওয়ার জন্য। এই সংখ্যাটা একবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয় বলে তাঁরা মনে করছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, পাকিস্তান থেকে চোরাকারবার রুখতে সর্বাগ্রে যেটা দরকার ছিল, সেই বি এস এফ-কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কাজ তাদের হাতে কারিগরি নজরদারির ক্ষমতা তুলে দিয়ে করা যেতে পারে। ■

গুজরাটের কর্ণাবতী (আমেদাবাদ)-তে ২, ৩, ৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা শিবির। প্রদেশের ২৬ হাজারের বেশি কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিন তুঘলককে বাংলার চ্যালেঞ্জ

মাননীয় মহম্মদ বিন তুলঘক
ঠিকানা অজানা

সুলতান, আপনি কোথায় থাকেন জানা নেই। তুঘলকাবাদ, তুঘলকিস্তান না তুঘলকপুর কে জানে! তাই এই চিঠি লিখছি বটে কিন্তু কোথায় পৌঁছবে বলা মুশকিল।

না, এটা নিছক চিঠি নয়। এটা বাংলা মুলুকের চ্যালেঞ্জ পত্র। না, খামখেয়ালিপনায় আপনি আর নিজেকে সেরা বলতে পারবেন না। আপনার আব্বা বাংলা মুলুকের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন বটে তবে এবার আপনি আর তা পারবেন না। আপনার দুর্নাম বা সুনাম যাই থাকুক না কেন বাংলা এবার আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। নয়া তুঘলকের কাছে আপনাকে হার কবুল করতেই হবে।

আপনি রাজধানী বদল করতে গিয়ে বছর খানেক পর পিছিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজ বাংলা মহাকরণকে নবান্ন বানিয়ে গঙ্গা পার করে দিয়েছে। বলেছিল বছর খানেকের জন্য কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিং এখন হেরিটেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদৌ আর কলকে পাবে কিনা কে জানে! রাজ্যের প্রধান সচিবালয় মানে রাজধানী বকলমে পাকাপাকি স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। আপনি কি সেটা পেরেছিলেন?

আপনি দেবগিরির নাম বদলে করে রেখেছিলেন দৌলতাবাদ। এছাড়াও জাহানপনা শহর, আদিলাবাদ দুর্গ এসব নাম দিয়েছিলেন। আপনার দৌড় ছিল ওই দুর্গ পর্যন্তই। কিন্তু আজ বাংলা কথায় কথায় নাম দেয়। নাম বদলায়। পার্কের নাম থেকে রাস্তার নাম খালি বদলায়। গত প্রায় চারবছরে বাংলা মুলুক এক নামকরণের মুলুক হয়ে গেছে। না, তার আগে থেকেই মেট্রো স্টেশনের নাম, ট্রেনের নাম দিয়ে বাংলা আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। এখানে ট্রেনের নাম আন্দোলন লোকাল, স্টেশনের নাম মহানায়ক উত্তম কুমার, গীতাঞ্জলি, জলের ট্যাঙ্কের নাম রামকৃষ্ণ, জল শোধনাগারের নাম জয়হিন্দ, রাস্তার নাম বিশ্ব বাংলা ('ব্র্যান্ড বাংলা'-র সঙ্গে 'বাংলা' মদিরার ব্র্যান্ডের কোনো সম্পর্ক নেই), বইয়ের নাম নন্দীমা, সুন্দরবনে পর্যটনের নাম আফ্রিকান সাফারি।

আপনি অনেক আবোল তাবোল ভাবনার কথা বলে নাম কিনেছেন, ইতিহাসে ঢুকেছেন। কিন্তু আপনি কখনও ভাবতে পেরেছেন, ইলিশমাছের বীজ তৈরি করা যায়, সেই বীজ বুনে চাষ করা যায়! ভাবতে পেরেছেন, ব্যাঙ্কে বিদ্যুৎ জমানো যায়! আপনার সময় তো অবশ্য বিদ্যুতের ব্যাপারই ছিল না। আপনি কখনও ভাবতে পেরেছেন, ধূপকাঠি তৈরি, আচার বানানো, সল্টেড বাদাম ভাজাও শিল্প। এসবও নাকি শিল্প তালুক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবের অঙ্গ। এসবের জন্যও নাকি ভালো বিনিয়োগ আসতে পারে। তুঘলকবাবু, আপনি যা স্বপ্নেও ভাবেননি তা আজ ভাবছে বাংলা। বাংলা মুলুক মনে করে যাত্রা, নাটক, নাচা-গানা-পাগলুও শিল্প। কালচার নয়, ইনডাস্ট্রি। সুতরাং আপনি অনেক গোলে পিছিয়ে আছেন জাঁহাপনা!

আপনি তো রাজধানী বদলাতে চেয়েছিলেন, মুদ্রা বদলাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন বাংলা কলকাতা শহরের রংটাই বদলে দিয়েছে। কলকাতা ক্রমশ নীল হয়ে যাচ্ছে। সাপে ছোবল মারলে যেমন হয় তেমন নীল। পাশে পাশে সাদার বর্ডার। থানা থেকে পায়খানা, ফুটপাথ থেকে ফুডপার্ক সব নীল-সাদা। তুঘলকজী, আজকের বাংলার কাছে আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। আপনি রাজকোষ থেকে যা খুশি খরচ করলেও একসময় আয় বাড়াতে কর বসিয়েছিলেন নানা রকম। আর আজকের বাংলা মেলা, মোচ্ছব, দান-খয়রাত করে রাজকোষ ভাঁড়ে মা ভবানী করার পরও বাড়ি-ঘর নীল-সাদা করলেই করে ছাড় দেয়। পারতেন? করা দূরের কথা, ভাবতে পারতেন?

সুলতান তুঘলক, আপনার দিন শেষ। শুনে রাখুন এই বাংলায় এখন দু'টি সচিবালয়। একটি দক্ষিণে। নবান্ন। সেটিই প্রধান। আর অপরটি উত্তরে। তার নাম উত্তরকন্যা। কেন? অত সহজে সমাধান হবে না আপনার প্রশ্নের। উত্তরটা জানতে হলে আপনাকে আগে বলতে হবে সচিবালয়ের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক কি? আর সেটা জানতে হলে গবেষণা করতে হবে আরও অনেক বিষয় নিয়ে। বলুন তো দুনিয়ার সব নামই কি ঠিকঠাক? কলকাতার বিখ্যাত রাস্তার নাম সিধু কানহু ডহর। তার মানে সিধু, কানহুর মতো ডহরবাবুরও শহিদের সম্মান পাওয়া উচিত।

কি বলছেন? ডহর কোনো ব্যক্তি নন? ডহর মানে রাস্তা? তাই!

তাহলে ইএম বাইপাসের নাম দিলাম সিএম ডহর।

—সুন্দর মৌলিক

গুণ্ডাদের নিয়ে রাজনীতির ফল

সিপিএম ভুগছে, একই অবস্থা হবে তৃণমূলেরও

রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০০ কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা যেভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাকে গৃহযুদ্ধ বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তৃণমূল ছাত্র-পরিষদ সমর্থকরা ব্যাপক বোমাবাজি, মারধর চালিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতেই দেয়নি। কলেজে কলেজে তাণ্ডব চলেছে পুলিশের উপস্থিতিতে। নির্বাচন হওয়ার আগেই সবুজ আবির নিয়ে বিজয় উৎসবে মাতামাতি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের এই চারটি জেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এককভাবে টি এম সি পি প্রার্থীরা জিতেছে ধরে নিয়েই আগাম উৎসব হয়েছে। একদা সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই— এই কায়দাতেই ৯৯ শতাংশ কলেজের ছাত্র সংসদ দখলে রেখেছিল। আজকে সেই প্রবল ক্ষমতাধর এস এফ আই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কারণ, তখন আদর্শহীন কিছু লুম্পেন বাম রাজত্বে ক্ষমতা দখল করেছিল পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে। শাসন ক্ষমতার পালাবদলের পর পুলিশ-প্রশাসন বামপন্থীদের পরিত্যাগ করে নয়া শাসকদল তৃণমূলের হুকুম তামিল করছে। কিন্তু এইভাবে দুর্বৃত্তদের পথে নামিয়ে প্রতিবাদী বিরোধী যুব শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ছাত্র সংসদের নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে এবিভিপি-র কর্মী সমর্থকরা টি এম সি পি-র গুণ্ডামির কাছে সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী রাউন্ডে নিশ্চিতভাবে প্রতিরোধ হবে। নির্বাচনকে রণক্ষেত্র করলে তার দায় শাসকদলকেই নিতে হবে। মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বলতে হবে কেন রাজ্যের চারটি জেলার কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হলো কেন?

গূঢ় পুরুষের কলম

গুণ্ডা, লুম্পেনদের নিয়ে রাজনীতি করার বিষময় ফল ভোগ করেছে সিপিএম তথা বামপন্থীরা। তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। একই অবস্থা হতে চলেছে তৃণমূলেরও। প্রকাশ্য সভায় মঞ্চে উঠে তৃণমূল যুব নেতা তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলেরই এক কর্মী থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে অন্তর্দলীয় কোন্দল এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন দলের লুম্পেনরাই নেতা-নেত্রীদের গণধোলাই দেবে। একটা আদর্শহীন রাজনৈতিক দলের শেষ পরিণতি এমনই হয়। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে রাজ্যের প্রয়াত কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিরোধীদের জব্দ করতে দলের ভৈরব বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্য কংগ্রেসকে তার চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে কংগ্রেস দলটি মুছে গেছে। লাঠি, বোমা, পাইপগান নিয়ে আজ তৃণমূলের যে সব লুম্পেনরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ২০১৬ সালে বিধানসভার নির্বাচনে পালা বদল হলে এদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইঁদুরের গর্তে লুকোবে।

তবে একটু কথা ভুললে চলবে না যে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের আস্থা ও সমর্থন হারিয়ে এখন পেশি শক্তির আশ্রয় নিয়েছে। তাই ছাত্র সংসদের নির্বাচন থেকে শুরু করে চলতি বছরে পুরসভার নির্বাচন এবং পরের বছরে বিধানসভার নির্বাচন সর্বক্ষেত্রেই সন্ত্রাস চালিয়ে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেবে না। এই অপচেষ্টাকে যে কোনো মূল্যে রুখতে হবে। মানুষ ঘুরে দাঁড়ালে গুণ্ডারা পালাবেই। অহিংস প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে রক্ত ঝরবে। তার দায়িত্ব শাসক দলের প্রশাসনকে নিতে হবে। মার খেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে অশুভ শক্তিরই জয় হবে। তা হতে দেওয়া যায় না। ঠিক এই কারণেই বলছি যে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের অত্যাচারে পরিস্থিতি বাস্তবে এখন গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক গুরুত্বহীন ছাত্র সংসদের নির্বাচনেই চার জেলায় কমপক্ষে ৬১ জন এবিভিপি প্রার্থী— সমর্থক ছাত্ররা মার খেয়েছেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানাই যে গুণ্ডাদের কাছে মাথা নত করবেন না। মিছিলে সামিল হয়ে প্রতিবাদ করুন। তাতে কাজ না হলে পুরসভার এবং বিধানসভার ভোটে ব্যালটে শাসকদলের অন্যায় ও দুর্নীতির জবাব দিন। সাধারণ মানুষই অত্যাচারের প্রতিরোধ করে। পরিবর্তনেরও পরিবর্তন করে। আমি রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপরেই ভরসা রাখি। তাঁরা কিছুতেই বাংলাকে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না। দিতে পারেন না। বিশ্বখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসিত পশ্চিমবঙ্গকে 'ব্যর্থ রাজ্য' বলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য থেকে কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন সর্বক্ষেত্রেই এই সরকার পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। এর প্রতিকার করতে পারে সাধারণ মানুষই। অন্য কেউ নয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংঘাত
সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

...হাতে মসী, মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।
আর সবি গেছি ভুলে, ভুলিনি এ মুখগুলি
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারি-ভারি, ম্লান মুখ সারি-সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা' কবিতাটির ছত্রে ছত্রে ছাত্র-দরদি শিক্ষকের ভাবাবেগ যেন প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে!

বস্তুত, এদেশে ছাত্রপ্রেমী শিক্ষকের এত অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, ছাত্রকল্যাণ ছাড়া শিক্ষকের আর কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলে এদেশের মানুষরা ভাবতেই শেখেনি। অন্যান্য পণ্যের মতো বিদ্যাও একটি পণ্য এবং একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষার ক্রেতা হলো ছাত্র এবং বিক্রেতা হলো শিক্ষক— এ ধারণা আমাদের সংস্কৃতিতে নিতান্তই বিজাতীয়। প্রাচীন ভারতে বিদ্যালয় বলে যখন কোনো আলাদা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না, তখন গুরুগৃহই ছিল ছাত্রদের কাছে বিদ্যালয়। পরমস্নেহে ছাত্রের মানবিক গুণের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমাজের ধারক-বাহক করে গড়ে তোলার মহান ব্রত শিক্ষকরা যেমন গ্রহণ করতেন, তেমনি ছাত্ররাও শিক্ষককে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় গুরুজ্ঞান করেই শিক্ষালাভ সম্পন্ন করতো। এমনিভাবেই আমাদের দেশে বিদ্যার্জনের অধ্যায়টি ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক স্নেহ, মমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হোত। বহুকাল পর্যন্ত এই পরম্পরা অটুট ছিল। সেকারণে সাম্প্রতিককালে স্কুল- কলেজে ছাত্রদের শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় আমরা যতটা না বিস্মিত হয়েছি তার থেকে অনেক বেশি ব্যথিত হয়েছি। এরজন্য শিক্ষক সমাজকে সার্বিকভাবে দায়ী না করা হলেও, তাঁরা যে সিংহভাগ দায়ী একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা ভুলিয়ে দিয়ে 'কালো ইংরেজ' তৈরি করা। তারই অনুষঙ্গ হিসেবে পরবর্তীতে শিক্ষা রোজগারমুখী হওয়া দরকার এ ধারণারও প্রচলন হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাকে রোজগারের মাধ্যম বলে মনে করার কারণেই ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে একপ্রকার ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য বোঝাতে সমাজবাদীরা গর্বের সঙ্গে একটি বুলি আউড়ে থাকেন। তা হলো— 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব', যা ভারতীয় দর্শন থেকে ধার করা একটি তত্ত্ব। বেদের সাম্যকে যে ভাবে আদ্যন্ত বিকৃত করে সমাজতান্ত্রিক সাম্যে পরিণত করা হয়েছে, ঠিক একই কায়দায় শিক্ষার অভিপ্রায়টিতেও একটি সংঘাতের রূপ দেওয়া হয়েছে। 'চেতনা আনা'র অর্থ হলো মানুষের মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ যা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে মানবিক গুণসম্পন্ন সমাজ-চিন্তক করে তোলে। এই চেতনা কখনোই একটি বিশেষ রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠা করার চেতনা নয়। আর বিপ্লবের ব্যাখ্যাতেও সমাজবাদীদের চিন্তার দীনতা প্রকাশ পায়। এই বিপ্লব কিন্তু 'শ্রেণীসংগ্রাম'-এর বিপ্লব নয়। বরং তা মানুষের চিন্তায় বিপ্লব যা সমাজকে সবসময় গতিশীল ও সংস্কারমুখী করে রাখে, যার অন্তিম ফল হলো সমাজের সর্বস্তরে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংঘাতের সূত্রপাত হয় গত ১৬ সেপ্টেম্বর, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে নিগ্রহের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি এবং অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টার প্রতিবাদে দুপুর থেকে উপাচার্যের দপ্তরের বাইরে ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান ধরনা শুরু করেন। রাত হতেই সেই ধরনা ঘেরাওয়ের আকার নেয়। পুলিশ ডেকে উপাচার্য ঘেরাও তুলতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত রাত দু'টো নাগাদ নিজের জীবন বিপন্ন দাবি করে উপাচার্য প্রশাসনের উপরমহলে বার্তা পাঠান। সেই বার্তা পেয়ে পুলিশ আসরে নেমে পড়ে। আচমকা প্রশাসন ভবনের আলো নিভিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারধর করে উপাচার্যকে 'উদ্ধার' করে পুলিশ। এ ঘটনার সমর্থনে উপাচার্য দাবি করেন যে বহিরাগতরা এসে আন্দোলন জোরদার করবে বলে তাঁর কাছে খবর ছিল। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের মেরে আন্দোলনকারীরা তাঁকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এরপর গত চার মাসে জল অনেকদূর গড়ায়। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন 'হোক কলরব' নামে রাজপথে নেমে আসে। পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড় অংশই উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকেন। আলোড়ন শুরু হয় রাজনীতির অঙ্গন থেকে নাগরিক সমাজেও। সরকারের অন্দরেও এ নিয়ে অস্বস্তি যেমন বাড়ে, তেমনি সরকারের বিভিন্ন মহলে শুরু হয়ে যায় মতপার্থক্য। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে যখন গত ২৪ ডিসেম্বরের সমাবর্তনে যাঁরা শংসাপত্র পাবার যোগ্যতা পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই যাতে ওই অনুষ্ঠানে থাকতে বাধ্য হন তার জন্য পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করেন আচার্য (রাজ্যপাল) স্বয়ং। যাঁরা সমাবর্তন বয়কট করবেন তাঁদের শংসাপত্র ডাকে পাঠানো হবে এবং সেগুলির উপর স্ট্যাম্পসহ লেখা থাকবে যে ওই পড়ুয়ারা সমাবর্তন বয়কট করেছিলেন— এমন ফরমানও জারি করেন তিনি। এদিকে সমাবর্তনে এক কৃতীছাত্রী উপস্থিত থেকেও 'মানবিক' কারণে আচার্যের হাত থেকে শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করায় আচার্য তাঁকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন, তাতে বিতর্ক ক্রমেই বেড়ে চলে। চরম অস্বস্তিতে পড়ে সরকারের একটা বড় অংশ যাঁরা উপাচার্য-র কাজকে এতদিন সমর্থন করছিলেন তাঁরাই এখন তাঁর পদত্যাগের কথা বিবেচনা করছেন। তাই সাধারণভাবে সকলের কাছে এটাই মনে হয়েছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উপাচার্যের অসংবেদনশীল ও অমানবিক আচরণই এই সংঘাতের মূল কারণ। অনেকে কিন্তু এর মধ্যে আলাদা একটা গন্ধ পাচ্ছেন। কারণটা যদি এতটাই সরল হবে তবে, কবেই উপাচার্যের দুঃখ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ঘটনার পরিসমাপ্তি হোত। আবার অনৈতিক জেনেও সরকার কেন উপাচার্যের পক্ষ নিল? উপাচার্যই বা কোন্ সূত্র থেকে জানলেন যে এই আন্দোলনে বহিরাগতদের যোগদান রয়েছে? উত্তেজনা প্রশমনে সরকারই বা কেন সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না? সমাবর্তন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেবার পরও কেন ছাত্রছাত্রীরা সমাবর্তনে হাজির হয়ে আচার্যের হাত থেকে শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করলেন? এরকম বহু প্রশ্নই আজ অনেকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এতকিছুর মধ্যেও একটি বিষয় নজর এড়ায়নি যে, আচার্যের হাত থেকে শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করা কৃতী ছাত্রীটি কিন্তু বাম ছাত্রসংগঠনের প্রথম সারির নেত্রী।

ছাত্রছাত্রীদের হাতে কর্তৃপক্ষের ঘেরাও হওয়া এ রাজ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষত যাদবপুরে নতুন নয়। ইতিহাস বলছে যে অধুনা 'হোক কলরব'-এর মাধ্যমে বারবার আলোচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছয় ও সাতের দশকে অতিবাম ছাত্র আন্দোলনের আঁতুড়ঘর ছিল। ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আকাদেমিক কাউন্সিলকে ঘেরাও করা হয়। এ রাজ্যে বামেদের দীর্ঘ রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তরটি রচিত হয়েছিল বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে বাম ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই। ছাত্রছাত্রীদের ভাবাবেগকে হাতিয়ার করে ও বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুরকে পুঁজি করে বামপন্থীরা ছয়-সাতের দশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে উত্তাল করেছিল, যার পুরোভাগে ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে আমেরিকা-বিরোধী সুর বিশ্বজুড়ে। ফ্রান্সে চলছে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ; মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে আমেরিকায় চলছে মানবাধিকার আন্দোলন। মাও জে দং-এর নেতৃত্বে চীনে চলছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মাও-এর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাদবপুরে তৈরি হয়েছে অতিবাম ছাত্র সংগঠন পিএসসিসি। শুধু ছাত্র আন্দোলনেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের এই সমস্ত উগ্র বাম আন্দোলনে এ বাংলা প্রগতির পথে এগোতে না পারলেও, বামেদের সিংহাসনটি যে পাকা হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ইতিহাসটি পরিবর্তনের সরকারের কাণ্ডারিরা বিলক্ষণ জানেন বলেই তাঁরা যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সিঁদুরে মেঘ দেখেছেন। তাঁদের ভীতি যে, ক্ষয়িষ্ণু বামশক্তি না আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত ধরে শক্তি সঞ্চয় করে। বামেদের স্কুলের একনিষ্ঠ ছাত্রী বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামসংস্কৃতিকে অটুট রেখে একটি দমনমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে, হুবহু তাদেরই কায়দায় প্রশাসনযন্ত্র দিয়ে বিরোধী আন্দোলন দানাবাঁধার আগেই তাকে শেকড়ে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। শুধু একটিই ভুল হয়েছে তাঁর। যে কাজটি বামেরা অত্যন্ত কৌশলে চূড়ান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করত, সেটা তিনি খোলাখুলি করতে গেছেন। একাজ তাঁর দল গত সাড়ে তিনি বছরে বহুবার করেছে। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যক্ষকে মারধর, ভাঙড় কলেজে শিক্ষিকাকে জগ ছুঁড়ে মারা কিংবা জয়পুরিয়া কলেজে অধ্যক্ষের উপর চড়াও হওয়া— সবক্ষেত্রেই কাঠগড়ায় হয় তৃণমূল নেতা, না হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

আমাদের ছাত্রজীবনে 'রাজনীতিতে ছাত্ররা' (Stuedents in Politics) বিষয়ক একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরীক্ষায় আসতে পারে ভেবে আমরা এর পক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধটি তৈরি করতাম ও মুখস্ত করতাম। বিপক্ষে যুক্তি দিতাম— 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', যার অর্থ অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। রাজনীতির জ্ঞান নেবার জন্য বাকি জীবন পড়ে আছে। স্বপক্ষে বলতাম, 'আজকের ছাত্র কালকের নাগরিক'। সুতরাং অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির পাঠও জরুরি। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমন ভাবনারই প্রতিফলন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ বিদ্যার্থী সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়। রাজনৈতিক দলের নির্দেশে ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রম স্থির করা হয়। তার কারণ, এই ছাত্রসংগঠনগুলির দ্বারা রাজনৈতিক নেতাদের মুঠোর মধ্যে সবসময়ের জন্য এক আজ্ঞাকারী শক্তি অবস্থান করে। এই পরিস্থিতি না পাল্টালে শিক্ষাঙ্গনে স্বার্থের সংঘাত এড়ানো সম্ভব নয়। আজকের ছাত্র আজকেরই নাগরিক। তাই ছাত্রছাত্রীর দল নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতি সচেতন হবে এটাই কাম্য। তবে বিদ্যার্থী সংগঠনের কাজকর্মে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, নতুবা ছাত্রসংগঠন তৈরির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ■

প্রেরণাদায়ী ঘটনা স্কুল-পাঠ্যসূচিতে রাখা দরকার

প্রবীর ঘোষ

দারুণ সুন্দর খবর। অনুপ্রাণিত ও আহ্লাদিত হওয়ার সংবাদ। কী? আমাদের রাজ্যের ছ'জন গ্রাম্য-কিশোরী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'জয়লাভ' করেছে। আরো একটু খোলসা এবং সহজ করে বললে, ওইসব-কিশোরী তাদের বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে, বিয়ে করতে রাজি হয়নি এবং সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেও, তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসেনি। তাদের এই জেদি কাজের জন্য ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাটিল দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মেয়েগুলিকে ডেকে তাদের আদর- শুভেচ্ছা- আশীর্বাদ-সম্মান —সবই জানিয়েছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্যের পিছিয়ে-থাকা জেলার এই ছয় কন্যার বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে 'জয়লাভ'-এর সত্যি কাহিনী ২০১৩ সালের প্রাথমিক-শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে রাখবেন স্থির করেছেন। এটাই খবরের মতো খবর—'পজিটিভ নিউজ'।

সুনীতা মাহাতো, আফসানা খাতুন, রেখা কালিন্দী, বীণা কালিন্দী, মুক্তি মাঝি ও সঙ্গীতা বাউরি— দরিদ্র পরিবারের অতি সাধারণ বাড়ির এই ছয় কন্যার বিয়ের ব্যাপারে পরিবারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে, নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করা আদৌ পুতুলখেলার মতো ব্যাপার নয়। প্রচণ্ড কঠিন, দুঃসাহসিক, জেদি কাজ— যা বাস্তবায়িত করা একরকম দুঃসাধ্য প্রায়। এই নাবালিকা মেয়েরা বিয়ে রুখে দিয়ে আরো পড়তে চেয়েছে— এবং এই ছয় কন্যার মধ্যে আছে আবার বনবাসী, মুসলমান, ওবিসি এবং নিত্যছায়াসঙ্গী দারিদ্র্য— তাদের সত্যি-কাহিনী পাঠ্যবইতে আসা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ও আনন্দ- সংবাদ। যা পড়ে অন্যান্য কচিকাঁচারা— নাবালিকারা, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে।

শুধুমাত্র বীণা, মুক্তি, রেখা, সুনীতা, সঙ্গীতা, আফসানারা নয়— পশ্চিমবঙ্গের আরো অনেক দরিদ্র পরিবারের নাবালিকারা বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়ার কাজে সাফল্য লাভ করেছে— যাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ, মালদা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায়।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের বাঁ দিকে আফসানা খাতুন ও সুনীতা মাহাতো, ডানদিকে রেখা কালিন্দী।

বাল্যবিবাহে সম্মতি না দেওয়ার পেছনে এইসব নাবালিকাদের সহায়তা করেছেন ইউনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন্স ফান্ড)— তাদের 'জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্প'-র অধীনে থেকে অংশগ্রহণকারী নাবালিকাদের 'সচেতন ও শিক্ষিত' করার সুবাদে। যার জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি মাননীয়া প্রতিভা দেবী সিং পাটিল এইরকম ২২ জন 'নাবালিকা' (এদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছর— এদের কারও বাবা প্রান্তিক চাষি, দিনমজুর, প্রায় বেকার অর্থাৎ হতদরিদ্রও বলা যায়) মেয়েকে দিল্লীতে ডেকে, তাদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে দারুণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। উল্লিখিত চার জেলার জেলাশাসকরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কর্মসূচিতে সহায়ক-সংস্থা ইউনিসেফ ও তাদের দুই কর্তা হোসে বাওয়া ও ভাস্কর খুলবে-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক মানুষকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়— এমন একটি সুন্দর উদ্যোগকে সফল করার জন্যে রাজ্যে বা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ইউনিসেফ এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'ডেস্ক রিভিউ অব চাইল্ড ম্যারেজ' নামক রিপোর্টের প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে পুরুলিয়ার ওই সাহসিনী নাবালিকারা— এটাও যথেষ্ট খুশির খবর। এবং আরো আনন্দের খবর, পুরুলিয়ার ওই ছয় কন্যা কলকাতার রেড রোডে (ইন্দিরা গান্ধী সরণি)

২০১২-র ৬৩-তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে।

যাদের কথা বলা হলো, তারা ছাড়াও আরো অনেক বালিকা তাদের বিয়ে নিজের ইচ্ছায় ও জেদে বন্ধ করেছে। তাদের মধ্যে আছে : বাঁকুড়ার দামড়াগোড়িয়ার সাইতুন খাতুন, কেঞ্জাকুড়ার অষ্টমী সোরেন, খাসবহড় গ্রামের সুন্দরী হাঁসদা, কুমিদ্যার মন্দিরা দাসমোদক প্রমুখ। এদের 'কাজে' উৎসাহ দিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং বাঁকুড়ার জেলাশাসক মহম্মদ গুলাম আলি আনসারির সহযোগিতা অবশ্যই রয়েছে। এরকম আরো কতো মেয়ের সত্যি-কাহিনী ও দুঃখ- বেদনার ঘটনা যে রয়েছে! হ্যাঁ, ওইরকম আরো একটি নাবালিকা। নাম— দীপা দাস। নদীয়ার রানাঘাটের কালীনারায়ণপুর আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় ছাত্রীটি তার শিক্ষক মহাশয়কে (সিদ্ধার্থ দত্ত) জানায়। শিক্ষক মহাশয় রানাঘাটের মহকুমা শাসক সুমন ঘোষের কাছে দীপাকে নিয়ে হাজির হয়ে এসডিও সাহেবকে জানান। তারপর ক্রমান্বয়ে বিডিও সাহেব দিব্যেন্দুশেখর দাস ও স্থানীয় পঞ্চায়েত দীপার পরিবারে তার মা-র সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষে, অবশেষে সাফল্যলাভ— বিয়ে নয়, পড়ার ব্যাপারে। অত্যন্ত বাস্তব ও জরুরি ব্যাপার যেটা— পঞ্চায়েত থেকে চাল-গম ইত্যাদি পাওয়া ও স্কুলের পক্ষে 'আর্থিক সহযোগিতা' (বই খাতাপত্তর টিউশন ইত্যাদি) দেওয়ার ব্যাপার করলে এবং সমাজহিতৈষীরা এগিয়ে এলে কঠিন জিনিসও অনেক সহজ হয়ে যায়, যাবে। এই-যে সমাজদরদী কল্যাণব্রতী মানুষদের কথা বলতে চাইছি, তেমন মানুষও অনেক আছেন। যেমন মালদহের গাজোলের কলেজ-ছাত্রী অঞ্জলি বর্মণ। সাতজন নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন অঞ্জলি দেবী। এরকম আরো অঞ্জলি দেবীদের সমাজ আন্তরিকভাবে চাইছে।

কথিত নাবালিকারা বিয়ে রুখে দেওয়ার কাজে হয়তো কাকতালীয়ভাবে এবং পরোক্ষে ভারত সরকারকে 'সহযোগিতা' করেছে। কেমন ভাবে? কেন্দ্রীয় সরকার দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় যথেষ্ট ভাবিত হয়ে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু পরামর্শ হাজির করেছেন— আইন করা নয়। তার কারণ, বিগত দশ বছরে ভারতে প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ বেড়েছে। ২০০১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল একশো দুই কোটির মতো। ২০১১-র জনগণনা শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১২১ কোটি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪২২। হ্যাঁ এর মধ্যে শুধু বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা সর্বাধিক— প্রায় ২০ কোটি, আর সবচেয়ে কম মানুষের রাজ্য সিকিম— সংখ্যা ৬ লক্ষ ৭ হাজার ৬৮৮। যদিও সমগ্র ভারতের মধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের জনসংখ্যা ৬৪ হাজার ৪২৯। উপরের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ আছে চতুর্থ স্থানে— ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৩৬। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রথম ও প্রধান পরামর্শ— কুড়ি বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে না করা, আঠারো বছরে সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক-র সিলমোহর পেলেও, জন্মনিরোধকের যথাযথ ব্যবহার, যা বিনামূল্যে সরকার দেবেন, দু'টির বেশি সন্তান না হওয়া, মায়েদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সচেতন করার জন্য সরকারি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর জনপ্রতিনিধি (এম পি, এম এল এ, ত্রিস্তর-পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও অন্যরা), স্বাস্থ্যকর্মী, বেসরকারি সংগঠন এবং সমাজ সচেতন মানুষদের 'কার্যকরী ভূমিকা' পালন করতে বলা হয়েছে। দেশে বিপুল জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে হাজারো প্রতিকূলতাকে রোখা এছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ওইসব নাবালিকা জন্মনিয়ন্ত্রণ-কাজের সফলতার সলতে জ্বালিয়েছেন। এবারে আমাদের তা আরো সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

হ্যাঁ, প্রসঙ্গক্রমে 'অন্য ঘটনার' কথা তো বলতেই হয়। প্রশ্ন আসবে, কথিত নাবালিকা কন্যাদের আগে, কর্মবীর কাং-এর 'কথা' ছোট-বড় সকল শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচিতে আনা হয়নি কেন? কর্মবীর কাং---কে? মুম্বই-সন্ত্রাসের কথা মনে আছে? সাল-তারিখের কথা মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু মুম্বই-সন্ত্রাসের সেই সত্যি ঘটনাবলী অধিকাংশ ভারতীয়েরই মনে থাকবে। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর— চারদিন ধরে মুম্বইয়ের সেই ভয়াবহ অবিশ্বাস্য জঙ্গি আক্রমণে তাজ-হোটেলের কর্মীদের অবিস্মরণীয় দায়িত্ববোধ, ত্যাগ ও সেবার এক উজ্জ্বল তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক রোহিত দেশপাণ্ডে। শুধু তথ্যচিত্র তৈরি নয়— তার বিশ্লেষণ, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে তা পড়ানো এবং স্কুলের 'ম্যানেজমেন্ট এগজিকিউটিভ এডুকেশন'-এর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা। কেন এতসব করা এবং কিজন্যে তা 'স্মরণীয়'? সেই সত্যি কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে 'টেরর অ্যাট দি তাজ বোম্বে : কাস্টমার-সেন্ট্রিক লিডারশিপ' নামক তথ্যচিত্রে। মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত তাজমহল হোটেল ২৬ নভেম্বর ২০০৮, সন্ত্রাসবাদীরা গুলি ছোঁড়ে— আকস্মিক আক্রমণ। তখন তাজমহল হোটেলে অতিথি ও কর্মচারী মিলে দু'হাজার জনের বেশি অবস্থান করছেন। সন্ত্রাসবাদীদের বোমাবর্ষণ ও গুলিতে তাজমহল হোটেলের সর্বোচ্চতলায় আগুন ধরে যায়। দুজন জঙ্গি হোটেলে অবস্থানকারীদের পণবন্দী করে। ততক্ষণে তাজ হোটেল ঘিরে ফেলেছে এন এস জি কমান্ডোরা— উদ্ধার কাজের জন্য। পরদিন জঙ্গিদের আবার গুলিবর্ষণ— কমান্ডোদের তার উত্তর গুলিতে দেওয়া। তখনও জঙ্গি দু-জনকে বাগে আনা যায়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনও (২৮ ও ২৯ নভেম্বর) জঙ্গি-কমান্ডো গুলি বিনিময়, উপর ও নিচতলায় আগুন, জানলায় আগুন। হোটেলের সমস্ত আলো আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, গুলি-বোমায় নিভেও গিয়েছে। বিভিন্ন তলার অসংখ্য ঘরে তখনও রয়েছেন অতিথিরা, হোটেলের কর্মচারীরা। অধ্যাপক রোহিত দেশপাণ্ডে তাঁর তথ্যচিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ঘটনার, তা হলো : হোটেল-কর্মচারীরা বাইরে

বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা, আটঘাট জেনেও, তাঁরা অতিথিদের ফেলে পালিয়ে যাননি— যা জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। বরং অনেক কর্মচারী হোটেলে- থাকা অতিথিদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, নিজেদের কাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যপালনে আন্তরিক হয়েছেন, প্রতিদানে অনেকে পেয়েছেন মৃত্যুও। আর কর্মীদের এই আত্মত্যাগ ও সেবাকাজে অনেক হোটেলবাসী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেও যান। এই অতুলনীয়, অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্তের শিখরে রয়েছেন তাজ হোটেলের ম্যানেজার কর্মবীর কাং। যখন কমান্ডো ও জঙ্গি উভয়পক্ষে গোলাগুলি চলছে, তখন চল্লিশ বছর বয়সী কর্মবীর নিজেকে গুলি থেকে বাঁচিয়ে হোটেলবাসী এবং নিজ কর্মীদের বলছেন : ঘরের মধ্যে থাকুন, বাইরে বেরোবেন না।

এক সময় গুলি যুদ্ধ শেষ হয়ে ত্রাণ কাজের শুরু। ডাক্তার ডাকা, আহতদের হাসপাতালে পাঠানো, পুলিশ ও সেনাদের সাহায্য করা, মৃত মানুষদের বের করে আনা— কতো কাজ। কর্মবীর সমানে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন। এক সময়, একটু সময় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দেখলেন, নিজের স্ত্রী নীতি এবং দুই পুত্র ৫ বছরের উদয় ও ১৪ বছরের সমরের নিথর মৃতদেহ। শোকস্তব্ধতা কাটিয়ে কর্মবীর নিজের কর্মীদের বললেন : মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সিনিয়ার অফিসাররা কর্মবীরকে চলে যেতে বললেন। তিনি যেতে রাজি হলেন না। বললেন, আমার সহকর্মীরা যেখানে কাজ করছেন, সেখানে আমি চলে যেতে পারি না। 'ত্রাণকাজ' শেষ করে তিনি যাবেন— মালিক রতন টাটা তাঁকে চলে যেতে বললে— একই কথা সবিনয়ে টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধারকেও বললেন।

হ্যাঁ, কাজকর্ম প্রাথমিকভাবে শেষ করে স্ত্রী-পুত্রদের সৎকারে চলে গেলেন। এ তো অকল্পনীয়, অতুলনীয় এবং দৃষ্টান্ত— যা ভাবা এবং বিশ্বাস করা বোধকরি কল্পনার বাইরে। আমি মনে করি, এই তথ্যচিত্র ভারত সরকার কিনে নিয়ে দেশের সমস্ত সিনেমা হলে, নির্দিষ্ট সিনেমাটি দেখানোর আগে, এই তথ্যচিত্র দেখানোটা বাধ্যতামূলক করুক। এবং দেশের ও রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজে পাঠ্যসূচি করুক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। বলা বাহুল্য, কর্মবীর কাং ও রোহিত দেশপাণ্ডেকে ভারত সরকার পুরস্কার প্রদানও করুক। হোটেলের সে সময়ের সাধারণ কর্মীদের সেবাকাজের জন্যও জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাভিনন্দন। অতর্কিত বিপদকে কীভাবে রোখা যায়— মোকাবিলা করা যায়, সেই শিক্ষাও আমরা এই ঘটনাবলী থেকে শিখতে পারি।

প্রসঙ্গত, জানাই, ওই জঙ্গি আক্রমণের রক্তাক্ত চারদিনে শুধুমাত্র তাজমহল হোটেলেই ক্ষয়ক্ষতি বা মৃত্যু হয়নি। আক্রান্ত হয় ট্রাইডেন্ট হোটেল, ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস, মেট্রো সিনেমা, লিওপোল্ড কাফে, কামা হাসপাতাল, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিস, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, নরিম্যান হাউস, হোটেল ওবেরয় এবং আশপাশের অনেক অফিস বাড়ি। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন বোম্বের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অশোক কামতে, এ টি এস প্রধান হেমন্ত কারকারে, মুম্বই পুলিশের 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বিজয় সালাসকর এবং প্রচুর পুলিশ ও কমান্ডো। ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী ২২ জন বিদেশিসহ ১৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল মুম্বইয়ের এই জঙ্গিহানায়।

তাজমহল হোটেলের ম্যানেজার কর্মবীর কাং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের মৃতদেহ সামনে দেখেও, যে পরিমাপহীন বেদনা-দুঃখ-আঘাতকে সেই সময়ে জয় করেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে তুলনারহিত, তাঁর

কর্মবীর কাং (বা দিকে), জ্বলছে তাজ হোটেল (২৬/১১)। — ফাইল চিত্র

জীবনসাধনার এক অত্যুজ্জ্বল দিকও বটে। স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমর অক্ষয় বাণী— 'আমার একমাত্র কামনা আমি যেন অন্যকে সাহায্য করতে সক্ষম হই'--- কর্মবীরের তখন মনে পড়েছিল কিনা জানি না।

তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওই দায়িত্বকর্তব্য পালনের মধ্যে ছিল অশেষ কাঠিন্য। বিপন্ন হোটেলবাসীদের 'রক্ষা করতে' কর্মবীর সদাজাগ্রত থেকে তাঁর পালনীয় দায়িত্বকর্তব্য ও সেবাকাজ করেছেন। তিনি হয়তো এরকম ভেবেছিলেন : মানবসেবার মধ্য দিয়েই আমি ঈশ্বরের দর্শনলাভ করতে চাই। কারণ আমি জানি, ঈশ্বর স্বর্গেও নেই, পাতালেও নেই, ঈশ্বর বিরাজ করছেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। হোটেল ম্যানেজারের সেদিনের তুলনাহীন আত্মত্যাগ, বর্তমানকালের জীবিত মনীষী-মহাপুরুষদেরও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। আশা করি, কর্মবীররা, সেদিনের উদ্ধার হওয়া হোটেল-অতিথিদের অন্তরলোকে চিরবিরাজিত থাকবেন। জাতির জীবনে, দেশাত্মবোধে কর্মবীররা প্রাতঃস্মরণীয়, চিরমৃত্যুঞ্জয়। ■

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী

'নীতি' শব্দটি আমাদের অচেনা বা অজানা নয়। শৈশব থেকে আমরা নীতিমূলক কথা বই-এ পড়েছি বা শুনে আসছি। কিন্তু 'নীতি' শব্দটি আজকাল কেমন জানি অচেনা লাগে। বিদ্যালয়ে নীতিমূলক কোনো গ্রন্থ বা রচনা পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় না। নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে আমরা পাশ্চাত্যকে শুধু অনুকরণ করছি না, অনুসরণও করছি। যার ফলস্বরূপ আমরা আধুনিক হচ্ছি, কিন্তু প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারছি না। আমাদের সময়ে নীতিমূলক গল্প, মরাল সায়েন্স ইত্যাদি বই পাঠ্যতালিকায় থাকত। এসব গল্প পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগত। এছাড়া সংস্কৃতে 'সূক্তি রত্নাবলী'তে অনেক কিছু শেখার বা জানার আছে— যা জানলে আমরা আরও সমৃদ্ধ হব।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। অধুনা বিদ্যালয়ে পুস্তক-তালিকায় এ জাতীয় বই থাকে না বললেই চলে। ছাত্রছাত্রীরা আজকাল ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি শব্দগুলির মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। যার ফলশ্রুতি তারা আজ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করে না। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সবই যেন কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। কোথাও কোথাও দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কের উপর প্রিয় অপ্রিয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই দেখি একটি ছেলে বা মেয়েকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও তারা শেখে না বা নেয় না সেই ভালো কথা। যার ফলে অসহায় পিতামাতাকে নীরবে চোখের জল ফেলতে হয়। নচেৎ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ক্ষান্ত হতে হয়।

শিক্ষায়তনে বা গৃহে সর্বত্রই নীতি মেনে চলতে হয়। তা না হলে প্রতি মুহূর্তেই হোঁচট্ খেতে হয় জীবনপথে। এক সময়ে গ্রীস দেশে ইশপ বলে একজন মানুষ বাস করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি দেখতে তেমন সুন্দর ছিলেন না। তাঁকে অনেক উপহাস শুনতে হোত তাঁর কুৎসিত চেহারার জন্য। তবে মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অতি জ্ঞানী। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পশু-পাখির কাহিনির রূপকে মানুষের কথাই নানাভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন— তা আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখি, জীব-জন্তুর রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের কথাই নানাভাবে লিখে আমাদের নীতিশিক্ষা দিয়ে গেছেন। অতিপরিচিত সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের গল্পের কথা কে না জানেন। এই গল্পটি ইশপ পেয়েছিলেন একদল লোভী মানুষের কাছ থেকে। সেই লোভী মানুষেরা ভেবেছিল একদিনেই অনেক ধন লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। কাহিনিটি এরকম— একবার গ্রীসের রাজা ক্রোসাস কিছু অর্থ দিয়ে ইশপকে ডেলফিতে পাঠিয়েছিলেন। এর কারণ সেখানকার পুরোহিতরা ছিলেন অত্যন্ত লোভী। তারা সাধারণ, দরিদ্র মানুষের থেকে টাকা চাইতেন। এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইশপ বাঁধলেন একটি বিখ্যাত সোনার ডিমপাড়া হাঁসের গল্প যা যুগ যুগ ধরে আজও চলে আসছে। এরকম অনেক গল্পই ইশপ সৃষ্টি করেছিলেন। সবই নীতিমূলক গল্প। অর্থাৎ সেগুলি পড়ে শুধু মজা পাওয়া যায় তা নয়, সেই সঙ্গে আমরা ভালো ভালো উপদেশও পাই। এক কথায় গল্পগুলি থেকে সততা, কৃতজ্ঞতা, দয়া, মায়া, ভালোবাসা, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে আমাদের জীবনে কত প্রয়োজন, তা আমাদের প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেন ইশপ।

জীবনে চলার পথে নীতিমূলক কথা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যেমন— চাণক্য শ্লোকের মধ্যেও এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের জীবনপথে চলতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, বাস্তবে অনেক কঠিন সমস্যা থেকে আমাদের মুক্ত করে। এক কথায় বলা যায়, এই সমস্ত শ্লোক জীবনপথের দিশারি।

প্রাত্যহিক জীবনে চাণক্যের শ্লোকগুলি খুবই উপযোগী। আসলে 'নিয়ম' ও 'নীতি'-র মধ্যে দূরত্ব মনে হয় বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় একস্থানে বলেছেন— 'চলো নিয়ম মতে।'

এছাড়া 'পঞ্চতন্ত্রে'র কথাও স্মরণযোগ্য। গল্প সাহিত্যের মধ্যে যা সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত তা হলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রাজা অমরশক্তি ও পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার কোনো ঐতিহাসিকত্ব নেই। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র ভারতীয় কথাসাহিত্যের অক্ষয় উৎস। আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২য় শতক হতে খৃস্টীয় ২য় শতকের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

এক সময়ে রাজারাই শাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিযুক্ত করতেন। সুকুমার চিত্তে নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব যাতে অতি সহজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে সেজন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একমাত্র গল্পকে হাতিয়ার বা মাধ্যম করতেন। গল্পের চরিত্ররূপে পশুপাখিকে নির্বাচিত করে শিশুমনকে জীবন ও প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করা হোত। সেজন্য এই জাতীয় সাহিত্যের ভাষা হয় সহজ, সরল ও সাবলীল। এর ফলে অতি সহজেই শিশুরা গ্রহণ করতে পারে।

রাজা অমরশক্তির তিন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে ছয় মাসের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ করার জন্য সমস্ত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটি

জাতীয় চরিত্র গঠনে নীতি ও ইতিহাস-শিক্ষা আবশ্যক

সমর কুমার বোস

আমাকে প্রতিদিন কাজের জন্য শহরতলি থেকে লোকাল ট্রেন ধরে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। যাতায়াতের পথে সহযাত্রীদের অনেক কথোপকথন, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, সমালোচনা এবং কটূক্তি সবই শুনতে পাই। কখনো তা অতি নিম্নমানের, কখনো বা তা হৃদয় বিদারক।

প্রশ্ন হলো— আমাদের দেশের জনগণের মান এত নেমে গেল কেন? আগে তো এমন ছিল না। আটষট্টি বছর হলো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এই কালখণ্ডটাতো কম নয়। আমাদের পরে স্বাধীন হয়েছে ইজরায়েল ও চীন— যারা অনেক এগিয়ে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ভারতমাতা অনেক কৃতী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আজ সাধারণ ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি খুব

> আমাদের ইতিহাস সঠিকভাবে গবেষণালব্ধ ফলের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়নি। এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় ত্রুটি। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও আমরা জাতিকে সঠিক ইতিহাস দিতে পারিনি।

রচিত হয়। এই গ্রন্থটি আবার ৫টি ভাগে বিভক্ত। গল্পগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি উপকারী।

গৃহে পিতা-মাতার থেকে একটি শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু শেখে। আবার বিদ্যালয়েও শেখে অনেক কিছু। তবে অধুনা শিক্ষা ব্যবস্থার যে হাল হয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ জীবন সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারছে কি? এখন শিশুকে কিছু বলতে গেলে সে তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। কিন্তু সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে বোঝানো যায় না। জীবনপথে সমস্যার সম্মুখীন হলে সে নিজে উপলব্ধি করে যে, হ্যাঁ কথাটা শুনেছিলাম— তাই এখন কাজে লাগছে।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর এক প্রিয় শিষ্যের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম গুড্‌উইন। এক সময়ে তিনি পত্রিকায় 'লিপিকার চাই' বিজ্ঞাপন দেখে স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য তাঁর জীবন, নীতি ছাড়া চলেছে বলেই জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে নিজে সেকথা স্বীকার করলেন অকপটে। শৈশব থেকে কোনো নীতি শিক্ষা পাননি বলে তাঁর জীবন ধ্বংসের পথে চলছিল। পরশমণি স্বরূপ স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনধারাই সম্পূর্ণ পালটে গেল। অতএব মেরুদণ্ড যেমন আমাদের সোজা হয়ে চলতে সাহায্য করে ঠিক সেরূপ নীতিশিক্ষাও আমাদের সমগ্র জীবনপথকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। কথায় বলে 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'। যিনি শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়, তিনিই একমাত্র জ্ঞান লাভের অধিকারী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বলা যায়— যার শিক্ষক বা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা, যিনি তন্ময় হয়ে জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন হতে পারেন একমাত্র তিনিই হতে পারেন একজন আদর্শ ছাত্র বা শিষ্য। তবে জীবনে চলার পথে সংযম না থাকলে সে শিক্ষা কিছুতেই লাভ করা যাবে না। কারণ, সংযম শিক্ষা মহত্তম শিক্ষা যা মানুষকে করে মহৎ। আর এজন্য প্রয়োজন কিছু সুন্দর নীতিকথা যা একজন ছাত্রকে শৈশব থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুন্দরভাবে জীবনগঠনে সাহায্য করে থাকে।

আবার দেখা যায় শুধু মেধা দিয়েও জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞানবৃক্ষের মূলে শ্রদ্ধারূপ জল ঢাললে তবেই সেই জ্ঞানবৃক্ষ সতেজ হয়ে ওঠে। পুরাণের সেই আরুণির গল্প সকলের জানা আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে গুরু আশ্রমে এসে দেখছেন শিষ্য আরুণি ফেরেনি। তাই নিয়ে কত উদ্বেগ গুরুর। তিনি চললেন সেই ক্ষেতে যেখানে আরুণি আলের মধ্যে শুয়ে জলের ধারাকে আটকাচ্ছে। গুরু তা দেখে স্তম্ভিত। এখানে গুরুবাক্য ও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাই তাঁকে ৬টি শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলল একমাত্র গুরুর আশীর্বাদে। এরকম অনেক গল্পই ছড়িয়ে আছে মহাভারত ও পুরাণের পাতায়।

বর্তমানে নিরাশার মধ্যে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আবার শুরু হতে চলেছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত। যাকে আমরা এতদিন ভুলেছিলাম। যাকে একসময়ে মৃতভাষা বলে কত অবহেলাই না করেছি। আজ সময় এসেছে ছাত্রদের মধ্যে নীতিমূলক শিক্ষা যা অদূর ভবিষ্যতে নিরাশার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে। ■

একটা লক্ষ্য করা যায়নি। উন্নতি কি হয়নি? উন্নতি অনেক দিকেই হয়তো হয়েছে কিন্তু নৈতিক, মানবিক ও আত্মিক উন্নতি যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হলো? কেন স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও আমাদের এই অবস্থা? আমার মনে হয়, শিক্ষার ত্রুটিই এর প্রধান কারণ। স্বাধীনতা যেভাবে অর্জন করার ছিল তা আমরা করতে পারিনি। ১৯৪৬ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আইন পাশ করে বৃটিশ ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল মাত্র।

'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার'-এর মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে যাঁরা ক্ষমতায় আসীন হলেন তাঁদের 'ভারতীয়' না বলে 'ইন্ডিয়ান' বললে ভাল বোঝানো যাবে। এই ইন্ডিয়ানদের সম্মুখ সারিতে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। আর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রবক্তারা হলেন— স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালে ইংরেজ 'Indian Education Act' চালু করে এবং তখনই Calcutta University, Bombay University, Madras University প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৬০ সালে বৃটিশ 'ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট' এবং 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট' পাশ করে ভারতকে শাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী তৈরি করবার ব্যবস্থা পাকা করে। না তারা সঠিকভাবে ভারতের ইতিহাস রচনার দিকে মন দেন, না ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল। আজও উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালভাবেই চলছে এবং এখানকার ছাত্ররা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কৃতিত্ব রেখে চলেছে। কিন্তু ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা অনেক কৃতী ছাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করবার পর ইউরোপ, আমেরিকা বা উন্নত দেশগুলিতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। দেশের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আমি কিন্তু এখানে শুধু বৈষয়িক উন্নতির কথা বলছি না।

আমার বলার বিষয় হলো নীতি শিক্ষা, মানবিকতার শিক্ষা, দেশপ্রেমের শিক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখবার শিক্ষা এবং দেশের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির শিক্ষা। এইসব শিক্ষা ব্যতীত একটি জাতি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে না বা সেই রাষ্ট্রও পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্ররা গুরুগৃহ থেকে সর্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করত। এই কিছুদিন পূর্বে 'এনডিটিভি'-তে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে একজন নামকরা স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও গুরুকুলের আচার্য বললেন যে, কৃষ্ণ চোদ্দ বছর ঋষি সন্দীপনি মুনির আশ্রমে থেকে বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষালাভ করে তবেই শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন।

আমাদের দেশে শিক্ষার সর্ব স্তরেই নীতি ও মানবিকতার শিক্ষা, দেশপ্রেমের শিক্ষা, প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করবার শিক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকী সঠিক ইতিহাসও পড়ানো হয় না। যে ইতিহাস আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়ে এসেছি তা আজ বিভিন্ন গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। দু'-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝানো যাবে। আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি যে, তাজমহল মমতাজের সমাধি যা মুঘল সম্রাট শাহজাহান তৈরি করেন। কিন্তু 'Indian History Re-writing Institute'-এর তৎকালীন কর্ণধার পি.এন. ওক তাঁর 'Tajmahal is a Hindu Temple' গবেষণালব্ধ বইতে এটা প্রমাণ করছেন যে, রাজপুত রাজা জয়সিংহের দ্বারা স্থাপিত এটি একটি শিবমন্দির। আমরা পাঠ্য ইতিহাসে অর্থে, দ্রাবিড় তত্ত্ব সম্বন্ধে যা পড়েছি তা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক Michel Danino লিখছেন যে, কিছু স্বনামধন্য ভারতীয় বিশ্বাস করতেন যে, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। স্বামী বিবেকানন্দও কঠোর ভাষায় বলেছেন— কোন্ বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছেন?

সুতরাং আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি তার উল্লেখ না আছে আমাদের কোনো গ্রন্থে আর না আছে দ্রাবিড়দের কোনো গ্রন্থে। Michel Danino আরও লিখেছেন যে, আজ পর্যন্ত হরপ্পা খননকার্য করে যা পাওয়া গেছে যেমন, দেব-দেবীর মূর্তি, স্বস্তিকা, ত্রিশূল, বাসনপত্র, গয়না ইত্যাদি তা কিন্তু দু'টো ভিন্ন সভ্যতার পরিচয় দেয় না। বরং একই সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচয় দেয়।

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের ইতিহাস সঠিকভাবে গবেষণালব্ধ ফলের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়নি। এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় ত্রুটি। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও আমরা জাতিকে সঠিক ইতিহাস দিতে পারিনি। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় বলেছিলেন যে আমরা যখন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ শেষ করেছি তখন তোমাদের পূর্বপুরুষরা জীবজন্তু শিকার করে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করত।

একটি জাতিকে মহৎ জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে গেলে তাকে তার গৌরবময় ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জাতিকে অবহিত করতে হয়। এবং ওইসব ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সেইসব মনীষীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান জনসাধারণকে দিতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক, মানবিক, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আপামর জনসাধারণকে দিতে হবে। তবেই ভারত জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

যোগ দিবস

বিশ্ব কী হিন্দুত্ব মেনে নেওয়ার দিকে এগোচ্ছে? রাষ্ট্র সঙ্ঘের 'যোগ দিবস' ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আমরা সে ইঙ্গিতই পাচ্ছি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে ১৭৭টি দেশ এই যোগ দিবস ঘোষণার ক্ষেত্রে সমর্থন জানিয়েছে। যা একটা রেকর্ড। যোগ হলো আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ। 'যোগ'-আমাদের পূজনীয় মুনি ঋষিদের দান। 'যোগ' আর 'ব্যায়াম' অনেকে এক করে ফেলেন। ব্যায়াম বা শরীরচর্চা শুধু শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু 'যোগ' সম্পূর্ণ ভিন্ন। যোগ আমাদের শরীরের সঙ্গে মনও সুস্থ রাখে। আর যার মন সুস্থ সেই হলো প্রকৃত সুস্থ মানুষ। প্রশ্ন হচ্ছে, আজ কেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ যোগ দিবস ঘোষণা করল? বলা ভালো করতে বাধ্য হলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো মাত্র মাস দেড়েক আগে যোগ দিবস ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এত বড় সিদ্ধান্ত তাও ১৭৭টি দেশের রেকর্ড সমর্থনে। কারণ, বর্তমান বিশ্বে মানুষের অস্থির মন এবং তার পরিণামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন আর তার পরিণামে তাদের অসুস্থ শরীর এবং নানাবিধ কঠিন মারণ রোগ। বিশেষ করে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা এই প্রতিযোগিতার বিশ্বে সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে হতাশ হয়ে বিভিন্ন মারণ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই রকম মানুষদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে 'যোগ'। যোগের একটি অভিন্ন বিষয় 'ধ্যান' অর্থাৎ মনস্থির রেখে কোনো কিছুতে যুক্তি হবার পদ্ধতি। মারণরোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির যদি মন সবল থাকে তবে তার পক্ষেও বহুদিন বেঁচে থাকা সম্ভব। আমি মনে করি বিশ্বের মানুষের নীরোগ শরীর ও সবল মনের প্রয়োজনে স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে যোগের জন্য একটি ক্লাস রাখা উচিত।

—**প্রদীপ লাহা,**
হরিণঘাটা, নদীয়া।

'মন কি বাত'

গত ১৪ ডিসেম্বর আকাশবাণীতে প্রধানমন্ত্রী তার মনের কিছু কথা বলেছেন 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে। প্রতি মাসে এক রবিবার সকাল ১১টায় এই অনুষ্ঠান গত তিন মাস শুরু হয়েছে। দেশের দরিদ্র মানুষরা রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শুনতে পারছেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও এটা সম্প্রচার হচ্ছে। গত মাসের বক্তব্যে তিনি দেশের মানুষের কাছে আগ্রহ করেছিলেন আমরা যা কিছু বস্ত্র পোশাক ব্যবহার করি, তার মধ্যে যেকোনো একটি যেন খাদি বা খদ্দর হয়। তাতে দেশের অনেক গরিব পরিবার উপকৃত হবে। এক মাসের মধ্যেই দেশবাসী মোদীজীর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে খাদির ব্যবহার শুরু করেছেন। যার ফলে খাদি বস্ত্র বিক্রয় ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মোদীজী যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আহ্বান করেছেন তাতে সারাদেশে এক নতুন দিশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যেমন হাতে ঝাড়ু নিয়ে সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষও সচেতন হয়ে উঠেছেন। তার কিছু নমুনা ই-মেল, চিঠির মাধ্যমে মোদীজীর কাছে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের সাতনার ভরত গুপ্তা লিখছেন রেলে ভ্রমণ করার সময় উনি দেখেছেন খাওয়ার পর প্ল্যাস্টিক প্যাকেট, নোংরা কেউ যেখানে-সেখানে ফেলছেন না। খুঁজছে কোথায় ডাস্টবিন আছে। না পেলে কামরার এক কোণে জমা করে রাখছে। ছোট শিশুরাও চকোলেট খেয়ে তার প্যাকেট নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলছে। কেউ নোংরা ফেললে বাকি সবাই তাকে বলতে শুরু করেছে। স্বচ্ছতার অভাবে নোংরা পরিবেশে সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয় গরিব মানুষেরা, ধনীরা নয়। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মোদীজীর এই সঙ্কল্প আমরা সমস্ত দেশবাসী মিলে সফল করে তুলব। ফলে ভারতের সমস্ত গরিব মানুষ রোগমুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে এক মহান বিশুদ্ধ ভারত অবশ্যই নির্মাণ করবে। আরও অনেক বিষয়ে তিনি বলেছেন যা প্রতি দেশবাসীর শোনা দরকার। ফলে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের জন্য কিছু করার প্রেরণা পাবে। অভিষেক পারিখ মোদীজীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন সারা দেশের যুব সমাজের একটা বড় অংশ বিভিন্ন নেশার ফলে ভয়ানক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। মোজীজী জানিয়েছেন এই নেশামুক্তির জন্য অনেক ব্যক্তি, স্বয়ংসেবী সংগঠন চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাঁরা যেন ভালো উদাহরণ তাঁকে লিখে পাঠান। আগামী এক মাসে 'মনের কথা' অনুষ্ঠানেও বক্তব্যে তিনি এই বিষয়ে বলবেন।

—**প্রহ্লাদ মান্না,**
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

অবক্ষয়ের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গবাসী বহু আশা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে পশ্চিমবাংলার মাটিতে এনেছিল। তার একটাই কারণ ৩৪ বৎসর বাম জমানায় এই সরকারের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবন কি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকী ব্যক্তি নিরাপত্তা হীনতার একেবারে চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। তাই তারা যত শীঘ্র পারে দুরাচার বামফ্রন্ট সরকারের জগদ্দল পাথরটাকে পশ্চিমবাংলার বুক থেকে নামাতে তৃণমূল সরকারকেই তাদের প্রকৃত উদ্ধারকারী বলে ভেবেছিল। কিন্তু তারা স্বপ্নেও ভাবেনি তখন যে এই তৃণমূল সুপ্রিমোর মনে এমন মিছরির ছুরি লুকানো আছে। তাই তারা তাদের সরল বিশ্বাসে এই সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সরকার দেশদ্রোহিতার মুখোশ পরে সংখ্যালঘু ভোটের আশায় তাদেরকে এমনভাবে তোষণ করবে যাতে কিনা তারা ভারতকে ধ্বংস করার চক্রান্ত লিপ্ত হয়। আজ বেশ পরিষ্কার এই জন্যই ২০১৪ সালের ঐতিহাসিক লোকসভা নির্বাচনে তারা শুধুমাত্র মোদীজীকে আটকানোর তাগিদে এতো আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছিল। আজ সেটা বর্ধমানের

খাগড়াগড় কাণ্ডের পর বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আজ পশ্চিমবাংলা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেমন— শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কৃষি, সবদিক দিয়েই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সরকারের ভ্রান্ত নীতিই তার জন্য একমাত্র দায়ী। আর একথাগুলি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাম জমানায় পশ্চিমবাংলা দীর্ঘ ৩৪ বৎসর ঠিক যতোটাই পিছিয়ে পড়েছিল, এই তৃণমূল সরকারের তিন বৎসরেই তার দ্বিগুণ পিছিয়ে পড়তে চলেছে।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সিরহাট, হাওড়া।

জাতীয় গ্রন্থাগারে অব্যবস্থা

জাতীয় গ্রন্থাগারের ধর্মতলাস্থিত ঐতিহাসিক পুরনো সংবাদপত্র বিভাগ ও রিডিং রুম ২০১৩ সালের ৮ নভেম্বর থেকে বন্ধ রয়েছে। বহু পাঠক-পাঠিকার গবেষণার স্থান এই কেন্দ্রটি। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এবং সংরক্ষণের অভাবে পুরনো সংবাদপত্রের নথি ধ্বংস হতে বসেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে বলে প্রচার চললেও কার্যত তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সাধারণ পাঠকদের মতামতকে উপেক্ষা করে ঐতিহ্যপূর্ণ বিভাগটি আলিপুরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৯০ বছর ধরে এটি পাঠক এবং গবেষকদের তথ্য অনুসন্ধানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় ধর্মতলা কেন্দ্রটি প্রবীণ পাঠক এবং গবেষকদের কাছে সুবিধাজনক। পুনরায় ধর্মতলাস্থিত রিডিং রুমটি চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে পুরনো দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র ও পুস্তক পুস্তিকার যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।

—**সপ্তর্ষি ঘোষ,**
কলকাতা-৭০০০০৯।

‘পদ্মশ্রী’ নয়, পদ্মভূষণ

স্বস্তিকার ‘রঙ্গম’ বিভাগে প্রকাশিত (তাং ১.১২.১৪) নিবন্ধে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছেন,— শিশিরকুমার ভাদুড়ি ‘পদ্মশ্রী’ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু, রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র ‘পশ্চিমবঙ্গ’ (২২ ও ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৯) নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি বিশেষ সংখ্যা (পৃ. ৬৯৫) সূত্রে জানা যায়, ভারত সরকার নাট্যাচার্যকে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রেরিত অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রামের জবাবে উক্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান করে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁকে একটি নাতিদীর্ঘ পত্রাঘাত (তা ২.২.১৯৫৯) করেছিলেন। সেই প্রত্যাখ্যান পত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (২.১০.১৮৮৯--- ৩০.৬.১৯৫৯) করেছিলেন— ‘‘Sir, I gather from the newspapers that a decorction of 'Padma Bhusan' has been awarded to me... I cannot accept the honour, and would request you to find out the means to relieve me of the burden of recciving it...’’। সেখানে তিনি এও বলেছিলেন— ‘‘...Had I been consulted, it would have been saved much embarrasment...’’।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

‘অবলা কেন মা এত বলে’

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের স্বস্তিকার প্রচ্ছদটি অসামান্য হয়েছে। প্রবন্ধগুলি থেকে বিভিন্ন দলের দেশবিরোধী অবস্থান সম্পর্কেও পাঠকদের অবগত করানো হয়েছে সুচারুভাবে। পশ্চিমবাংলার পঙ্কিল বিধানসভায় এখন মাত্র একটি পদ্মফুল প্রস্ফুটিত রয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর সেখানে শত পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক।

এই সংখ্যাতেই ‘অবলা কেন মা এত বলে’ শীর্ষক একটি রচনায় বাজারি পত্রিকাগুলির মতো অহেতুক ও মিথ্যা পুরুষ-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ কিছু মন্তব্য দেখে খুব খারাপ লাগল। সেখানে নারীদের ‘নিজ যোগ্যতা’ ‘আর্তচিৎকারের দিন শেষ’ কথাগুলি একেবারেই ভ্রান্ত। প্রত্যেক সফল পুরুষের পিছনে যেমন একাধিক নারীর অবদান থাকে, তেমনই প্রতিটি সফল নারীর পিছনেও একাধিক পুরুষের অবদান থাকে। এই প্রবন্ধে সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তার আগের সংখ্যাতেই ভারতে নারী রাজ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বৎসরেরও ‘ভারতে নারী সাধনার পরম্পরা’ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের গোপিনী, ডাকিনী, যোগিনী সহ বহু সাহসিনী নারীর সাফল্যের কথা বর্ণিত আছে। কাজেই আগেকার দিনে সব নারী অবলা ও নির্যাতিতা ছিল— এই ভ্রান্ত একপেশে ধারণা প্রচার করলে নর-নারীর বিদ্বেষ আরো বাড়বে।

—**রবীন সেনগুপ্ত,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭,
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন

দেবব্রত ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্রদর্শন কখনোই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হতে পারে না। প্রাচীন রাজতন্ত্র, নিকট অতীতের সামন্ততন্ত্র, আধুনিক ধনতন্ত্র, সমকালীন গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কোনো তন্ত্রই সভ্যতার শেষ কথা তো নয়ই, একমাত্র সমাধানও হোতে পারে না কোনো নিয়মেই। মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছিল ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়— এই সত্য স্বামীজীর জানা ছিল। আজকের রাজনৈতিক মূল্যবোধ তাৎক্ষণিক সমকালীন সমস্যা ও সঙ্কট থেকে রসদ সংগ্রহ করে। বিবেকানন্দ অনেক দূর অবধি দেখতে পারতেন। তাঁর সেই প্রজ্ঞাচক্ষু ও বোধিলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

স্বামীজী জানতেন মানুষের সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, পরিবারের সঙ্গে সমাজের, এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের সম্পর্ক নিয়ত পরিবর্তনশীল, মার্কসকথিত আর্থিক বৈষম্যই তার একমাত্র কারণ নয়। মানুষের চিন্তায় ও স্বভাবে পরিবর্তন এলে তার প্রতিফলন তার কর্মে পড়বেই এবং কর্মজীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সরে গিয়ে সমষ্টিকেন্দ্রিক হলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বৈষম্য ও বৈসাম্য থাকবেই, তাকে দূর করা যায় না। কিন্তু বৈষম্য ও বৈসাম্যকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে হয়।

মহাভারতে একটা শ্লোক আছে— **"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"** —যার অর্থ হলো এ জগতে মানুষের চাইতে বড় আর কিছুই নেই। আরেক জায়গায় রয়েছে— "ধনেন কিং যন্ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে" যার অর্থ যে বিদ্যে, যে অর্থ বা যে শক্তি অন্যায়কে প্রতিহত করতে পারে না, সেই বিদ্যা, ক্ষমতা, যশ বা অর্থের কোনো মূল্য নেই, সেই দেহের কোনো মূল্য নেই যে দেহ নিজ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অপারগ। বিবেকানন্দের ধর্ম সমগ্র জীবনের ধর্ম যার নিরন্তর অনুশীলন মানুষকে পশুর প্রাণিক স্তর থেকে মনোময় স্তরের উপরে বোধিতে উন্নীত করে।

স্বামীজী মনে করতেন দেশ বা রাষ্ট্র অসংখ্য ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্বের সমষ্টি, তাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি চলবে আরেকটা সমান্তরাল প্রবাহ যা ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা, সৃজনশীলতা, ভাবাদর্শের মুক্তি, জীবনদর্শনের প্রসারতা, ভাব ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্ভবপর করবে স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ না রেখেই। শান্তি ও মুক্তি আসে ভেতর থেকে। বিবেকানন্দের রাষ্ট্র ও সমাজ ভাবনা পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ফলশ্রুতি নয়। বিবেকানন্দ অবশ্যই গণতান্ত্রিক কিন্তু সেই গণতন্ত্র ইউরোপের আধুনিক গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রের দুটো প্রধান বিচ্যুতির কথা তিনি বারবার বলেছেন। গণতন্ত্রের একটা বিপদ আসে সাধারণ দেশবাসীর কাছ থেকে। গণতন্ত্রের অত্যধিক প্রয়োগে বেড়ে যায় উচ্ছৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা। কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা শেষাবধি স্বার্থপর আত্মসুখসর্বস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়। এই সর্বগ্রাসী গণতন্ত্র বিবেকানন্দ চাননি যেমন তিনি চাইতে পারেননি ধনতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র, যদিও সব 'তন্ত্র' এবং 'বাদ' সভ্যতাকে কিছু না কিছু দিয়েছে।

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের সমর্থক, তবে সেই সমাজতন্ত্র মার্কস বা লেনিন ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্র নয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন রেজিমেন্টেড সমাজ সভ্যতার প্রতিকূল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের কাছে বাধ্যতামূলক নতি স্বীকার করালে সমাজ নির্দেশিত কাজে ব্যক্তির নিপুণতা ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তির নৈপুণ্য বৃদ্ধি হলে সমাজ বহমান থাকে। সমাজতন্ত্রের ত্রুটি হলো সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের ফলে ব্যক্তির উদ্যম, মননশীলতা, অনুভূতির সাবলীল তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়। সমাজতন্ত্র এখানেই অপূর্ণ।

বিবেকানন্দ অবশ্যই সাম্যবাদী, তবে তাঁর সাম্যবাদ শুধুমাত্র অধিকারবাদের সঙ্গে সমর্থিত বা সম্পর্কিত নয়, কর্তব্যবাদ ও

দায়িত্ববোধের সঙ্গেও বিজড়িত। বিবেকানন্দ বলতেন, কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সমাজের স্বভাব। আমরা চাই কারুর কোনো বিশেষ অধিকার থাকবে না অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির সামগ্রিক প্রতিভা ও দক্ষতা বিকাশের সমান সুযোগ থাকবে। অধিকারভেদ, প্রতিভা ও দক্ষতা ভেদে সাম্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, সাম্য অচল, ধ্রুব, নিত্য সত্য নয়— এটা তাঁর জানা ছিল। কালের নিয়মে সাম্যের সংজ্ঞা বদল হয়।

বিবেকানন্দ বলেছেন, অন্তর্নিহিত ঐক্যজনিত মানবিক সাম্যের কথা, বাহ্যিক বলপ্রয়োগজনিত বাধ্যতামূলক সাম্যের কথা নয়। মার্কসবাদী ভাবনা দাঁড়িয়ে আছে হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা আর বিদ্বেষের ওপর আর স্বামীজীর সাম্য এক নিরন্তর লড়াই যেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই। স্বামীজী বলেছিলেন, শ্রেণীসংগ্রামের বদলে জনসাধারণ যদি সর্ববিধ অধিকার পেয়ে যায় তাহলে সেটাই বাঞ্ছিত পথ। তিনি এটাও বলেছিলাম যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিরোধের আগুন একবার জ্বলে উঠলে সমস্ত মানব-কল্যাণমূলক প্রগতি কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছিয়ে যাবে।

মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা মার্কসবাদকে সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বমানুষের ক্ষেত্রে সমপ্রযোজ্য নয় বলে মেনে নিয়েছেন পরবর্তীকালে। মার্কস-এঙ্গেলস- লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ এই পাঁচ কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক সাম্যবাদের যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা ছিল বিশেষ সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের জন্য উদ্ভূত ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া অর্থনৈতিক সাম্যবাদ। বঞ্চনা জন্ম দেয় প্রতিহিংসার যা আরো ভয়ঙ্কর। বিবেকানন্দের সাম্য হৃদয়ের সাম্য, আভ্যন্তরীণ ঐক্যের সাম্য যা ভালবাসা ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য। সেই সত্য তুলনামূলক অর্থনীতি বা সমাজনীতি নয় বরং ভাবরাজ্যের উচ্চতর ও মহত্তর সত্য যেখানে সাম্যের জন্য রক্তপাতহীন, হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণাহীন, ক্রোধহীন অন্তর্তেজ সম্ভূত এক ঐক্যবাদী সংগ্রাম চলতে থাকে।

উগ্র বামপন্থী আগ্রাসী মতবাদ ও নির্জীব রক্ষণশীল আবেদন- নিবেদনমূলক দক্ষিণপন্থা থেকে তিনি সমদূরত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী। বিবেকানন্দ সাম্যবাদী কিন্তু মার্কসবাদী নন। তিনি বিপ্লবী কিন্তু লেনিন-স্ট্যালিন নন। তিনি বিদ্রোহী কিন্তু চে-গুয়েভারা নন, তিনি সংস্কারক কিন্তু রামমোহন-মার্টিন লুথার-বিদ্যাসাগর নন, তিনি দার্শনিক কিন্তু শঙ্করাচার্য নন। তিনি উপনিষদ কথিত দ্রষ্টাপুরুষ যিনি আগামীকালের নায়ক, আগামীপ্রজন্মের কথা ভাবেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্যবাদ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের সার্থক সমন্বয় যেখানে অকৃত্রিম — এই তো ছিল স্বামীজীর দর্শন। হেগেল-স্পেন্সার- মিল- বেন্থাম -গ্রীণ- শোপেন-হাওয়ার-স্পিনোজা-নীৎসে-কান্ট-বার্গস সবাইকেই তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন এবং আমাদের প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করতে পেরেছিলেন। মার্কসবাদী সাম্যবাদ ও সর্বগ্রাসী একদলতান্ত্রিক শাসনক্ষমতা যে সাধারণ মানুষের স্বকীয় উন্নতির ও মানবিক বিকাশের প্রতিকূল ও প্রতিবন্ধক সেটা স্বামীজী বারবার বলেছেন একশতক আগে আর আজকের মুক্তমনা বামপন্থী চিন্তাবিদেরা মার্কসবাদী সাম্যবাদ ও তার লেনিনবাদী প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিয়েছেন। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক আর্নেস্ট ফিশার বলেছেন প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র যৌথভাবে সমাজতন্ত্রকে গ্রাস করেছে যার দায় মার্কসবাদী রাষ্ট্রনায়কেরা এড়াতে পারেন না। ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে আমাদের ফিরে আসতে হয় বিবেকানন্দের কাছেই যেখানে অর্থনীতি নয়, আত্মিক উত্তরণ-ই হচ্ছে সভ্যতার নিয়ামক ও প্রগতির নিয়ন্ত্রক। মানুষ যতদিন না নিজ স্বভাব ও প্রকৃতির ওপর, নিজের লোভ, কামনা-বাসনা ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করছে, কোনো রাজনৈতিক দর্শন, মতবাদ, লড়াই, শাসন বা বহির্বিপ্লব জগৎ ও জীবনকে বদলাতে পারবে না। বিভিন্ন দেশ ও সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে বিশ্বের সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করা যায় না।

বিবেকানন্দ কখনোই শূদ্রশাসনকে ইতিহাসের শেষকথা বলে স্বীকার করেননি। তিনি বারবার বলেছেন জীবন ও কালের স্বাভাবিক নিয়মে আবার উন্নততর ব্রাহ্মণ্যযুগ ফিরে আসবে। যাঁরা মহাভারত পড়েছেন তাঁরা জানেন বেদব্যাস ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বলতে কী সংজ্ঞা নিরূপন করেছিলেন এবং বিবেকানন্দের ইতিহাস ও সমাজচেতনায় মহাভারতের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। জন্ম নয়, কর্ম ও স্বভাব ঠিক করে দেয় মানুষের জাতিসত্তাকে। দাসত্ব থেকে মুক্তি না পেলে চৈতন্যের বিকাশ হয় না, চৈতন্য ছাড়া বিপ্লব হয় না, বিপ্লব ছাড়া সমাজ বদলায় না। চেতনাকে উপেক্ষা করে মার্কসবাদীরা যে জড়বাদী দর্শনকে আমদানি করলেন তা জন্ম দিল ভোগবাদের এবং শেষমেষ দলীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ স্থাপিত হলো— সাম্যবাদ নয়। স্বামীজী Survival of the fittest থিয়োরিকে আক্রমণ করেছিলেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে স্বামীজী চরম ও পরম সত্য বলে মেনে নেননি। ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে মেনে নিলে ক্রমঃউন্নতি তত্ত্বকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সভ্যতার ইতিহাসে বারবার সাংস্কৃতিক ও মানবিক অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে। বিবেকানন্দ কঠোরভাবে Hereditary Transmission থিয়োরিকেও আক্রমণ করেছেন। বিবেকানন্দ রাজনীতিবিদ ছিলেন না কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল ভারতের সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংসা ও সশস্ত্র সংগ্রামের দুটো ধারাই। ইজম নামক জনপ্রিয় শব্দের সীমাবদ্ধতা বিবেকানন্দের ধর্মনিষ্ঠ বিজ্ঞান, বিজ্ঞাননিষ্ঠ দর্শন, যুক্তি সমর্থিত ধর্ম এবং নির্ভীক নির্মোহ ইতিহাসবীক্ষণকে আচ্ছন্ন বা সীমায়িত করতে পারেনি। তিলক থেকে গান্ধীজী, শ্যামাপ্রসাদ থেকে নেতাজী, রাধাকৃষ্ণান থেকে রাজাগোপালাচারী, জগদীশচন্দ্র বসু থেকে এ পি জে আবদুল কালাম, বাঘা যতীন থেকে সূর্য সেন সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। বিবেকানন্দ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম আচার্য এবং এই সহস্রাব্দেও প্রাসঙ্গিক।

(স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

পৌরাণিক নগর

রাজগৃহ

গোপাল চক্রবর্তী

মহাভারত আনুযায়ী মহাশক্তিধর মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। রাজগৃহ গিরিব্রজ নামেও পরিচিত ছিল। পৌরাণিক যুগে রাজগৃহ ছিল এক সমৃদ্ধ নগর। বৈভার, বিপুল, রত্নাগিরি, উদয়গিরি, শোনগিরি— এই পাঁচ পাহাড়ে রাজগৃহ ঘেরা ছিল সেকালে। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। জরাসন্ধের আখড়ায় ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের মারাত্মক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে জরাসন্ধ নিহত হয়েছিল।

বুদ্ধের রাজগৃহ আগমনে মৌর্য সম্রাট বিম্বিসার দীক্ষা নেন বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধের সাধন জীবনের সঙ্গেও রাজগৃহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ রাজগৃহে অবস্থান করেছিলেন বুদ্ধ। আবার বিংশতম জৈন তীর্থঙ্কর মুনিসুব্রতের জন্মস্থানও রাজগৃহ। আর শেষ তীর্থঙ্কর (২৪তম) বর্ধমান মহাবীর ১৪টি বর্ষাঋতু এখানে অবস্থান করেন। বিপুল পর্বতে প্রথম ধর্মসভাও করেন মহাবীর। মহাবীর এখানে শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনাও করতেন। স্মারক রূপে দিগম্বর জৈন তীর্থ মন্দির রয়েছে পাহাড় চূড়ায়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকও এখানে রচিত হয়। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত উদ্যান বেণুবন এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের বাসের জন্য তাঁর প্রমোদকাননে এই বেণুবন বিহার গড়ে দিয়েছিলেন। এটি ছিল গুরু বুদ্ধকে রাজা বিম্বিসারের গুরুদক্ষিণা। বুদ্ধ এই বেণুবনেই দ্বাদশবর্ষ অবস্থান করেছিলেন। বৌদ্ধতীর্থ হিসাবে বেণুবনের গুরুত্ব অসীম। খননকার্যের ফলে এখানে অতীতের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বেণুবনের দক্ষিণ-পূর্বে সরস্বতী নদী পেরিয়ে সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মকুণ্ড। ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মূর্তি হয়েছে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ও পরাশর অর্থাৎ সপ্তঋষির। আর পাহাড় ঢালে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ— সাতটি ধারায় বেরিয়ে আসছে জল। প্রতিটাতেই উষ্ণতার তারতম্য আছে।

এই রাজগৃহেই (বর্তমান রাজগীর) রয়েছে বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রুর তৈরি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। খৃস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে দ্বিস্তর প্রাচীরে ঘেরা পাহাড় কেটে পরিখাযুক্ত এই সুবিশাল দুর্গটি তৈরি করিয়েছিলেন। 'অজাতশত্রু স্তূপ' নামে বৌদ্ধ স্তূপটিও দর্শনীয়। সম্ভবত এখানেই বিম্বিসার বুদ্ধের পদনখ কণা স্থাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"নৃপতি বিম্বিসার,
নমিয়া বুদ্ধে,
মাগিয়া লইল পদ নখ কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ কাননে,
তাহার উপর রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ,
শিল্প শোভার সার।"

পুত্র অজাতশত্রুর হাতে প্রথমে বন্দী এবং পরে নিহত হয়েছিলেন রাজা বিম্বিসার (খৃঃপূঃ ৪৯০ অব্দে)। বন্দী দশায় যেই কারাগারে তাঁকে রাখা হয়েছিল তার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। স্থানীয় লোকেরা এখনো এটাকে বলে বিম্বিসারের জেল। এখানে বসেই বন্দী বিম্বিসার দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ে অবস্থানরত গুরু বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

রাজগৃহের অপর এক দর্শনীয় স্থান জরাসন্ধের ধনাগার 'শোন ভাণ্ডার'। জনশ্রুতি এই গুহার পেছনে ধনরত্ন লুকানো আছে। দেওয়ালে ৩২টি লিপিতে ধনরত্নের হদিশ লেখা আছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন কিন্তু ওইগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি আজও।

রাজগৃহের উত্তরে গৃধ্রকূট পাহাড়। পাহাড় চূড়ায় আছে দু'টি গুহা ও বিধ্বস্ত এক চত্বর। এখানে বুদ্ধদেব স্বয়ং ও তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার এখানে বুদ্ধ দর্শনে আসতেন। অজাতশত্রুর হাতে বন্দী এবং হত্যার পরেও কিছুদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বুদ্ধ এখানে ছিলেন।

প্রথম জীবনে বুদ্ধ-বিদ্বেষী হলেও পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন অজাতশত্রু। তিন মাস বর্ষাযাপনে বুদ্ধ এখানে শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনা এবং উপদেশ দিতেন এবং বর্ষাবসানে সন্ন্যাসী শিষ্যদের কঠিনচীবর (কষায় বস্ত্র) দান করতেন।

রাজগৃহের আম্রবন বা জীবকের আমবাগানটি ছিল মগধরাজের রাজবৈদ্য জীবকের চিকিৎসালয় এবং গবেষণাগার। কথিত আছে স্বয়ং বুদ্ধ একদা এখানে জীবকের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৈভার পাহাড়ের সপ্তপর্ণী গুহায় অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম বৌদ্ধ সাঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই স্মৃতিতে জাপান রত্নাগিরি পাহাড়ের শীর্ষে বুদ্ধের জন্মের ২৫০০ বছর পূর্তিতে এক মনোরম স্তূপ নির্মাণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরে চির উজ্জ্বল রাজগৃহ। ■

চিরদিনের গল্প

গোখুরো শিকার

সুকুমার রায়

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুর বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেঝের নিচে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একবার ঝাঁঝরার মতো করে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত। কতদিন কত পেলে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না। তখন সাহেব ভাবলেন ইঁদুর মারবার বিষবড়ি না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পলিয়েছে। সবাই বলল, 'ব্যপারখানা কি?' দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড়ো গুরুতর— ইঁদুরের গর্তে প্রকাণ্ড দুই গোখরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান সব চলতে ফিরতে সাবধানে থাকে। রাতে গাড়ি জুততে হলে লোকজন, লাঠি, মশাল নানারকম হাঙ্গামার দরকার হয়। তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই পারে না। সাহেব দেখলেন মহামুশকিল, এর চাইতে ইঁদুরই ছিল ভালো।

সাহেবের যে চাপরাশি, সে লোকটি ভারি সেয়ানা--- সে বললে হুজুর, 'আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার-আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম নিয়ে আসছি।' পরেরদিন চাপরাসি সেই চার-আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির— একটা বঁড়শি আর ছিপ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত ব্যাঙ। দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসিকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বললেন, 'বেয়াকুব! তোকে সাপ মারতে বললাম, আর তুই মাছ ধরার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি!' চাপরাসি সে-সব কথায় কান না দিয়ে ব্যাঙটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চলল। তামাশা দেখবার জন্যে সবাই তার পিছনে পিছনে চলল। তারপর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাঙটাকে গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসি শক্ত করে ছিপের গোড়ায় ধরে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর চাপরাসি সেই আধ-গেলা ব্যাঙসুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্তের মধ্যে থেকে হিড়হিড় করে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন ক্রমাগত গিলতেই থাকে। যা একবার গলায় ঢোকে তাকে আর ঠেলে বার করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাঙ আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ। এমনি করে গোখুরো-মশাই চার-আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তারপর লাঠিপেটা করে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ!

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না। সবাই হয়রান হয়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় এক কর্মী দৌড়ে এসে খবর দিল সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব ছুটে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, সাপ তখনো গর্ত থেকে বেরোয়নি। চাপরাসি ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্তের বাইরে এসেছে এমন সময় চাপরাসির টানে ব্যাঙটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য লাঠিপেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাঙ বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু-একটা তখনো বেঁচে ছিল— একটা তো একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব তো এ কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। সাপের পেটে গিয়েও যে কোনো জন্তু বেঁচে থাকতে পারে, এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও এটা নতুন কিছু খবর নয়। আমেরিকার 'শিংওয়ালা' সাপের সম্বন্ধেও এইরকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মতো খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না। তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন 'রেড ইন্ডিয়ান' জাতের লোক এই সময়ে তাকে দেখতে পেলে মাথায় ডাণ্ডা-পেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্ত-গেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যা হোক, সাহেব তো সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে, আস্তাবলের মেঝের নিচে সাপের ছোটো-ছোটো বাচ্চায় একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। এখন উপায় কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গামা, তবে এগুলো যখন বড়ো হবে তখন কি হবে! আবার চাপরাসির ডাক পড়ল। চাপরাসি বলল, 'হুজুর, আমি এরও উপায় জানি।' এবারের উপায়টি আরো আশ্চর্য। এবার প্রকাণ্ড বড়ো কোলা ব্যাঙ এনে অস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা মহা ফূর্তি করে পেট ভরে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় করে দিল। সাপকে দিয়ে ব্যাঙকে খাইয়ে, তারপর ব্যাঙকে দিয়ে সাপ গেলানো। চমৎকার শিকার না?

১৯১৬ সালে প্রকাশিত

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর জন্ম মৃত্যু? বাবার নাম? স্বামীর নাম?

২. দিলীপকুমার রায়-এর জন্ম মৃত্যু? বাবার নাম?

৩. ‘পান্থজনের সখা’ বইটির লেখক কে? কাকে নিয়ে লেখা?

৪. রবীন্দ্রসংগীতকে এক ‘অবিনাশী গীতিমালা’ বলেছেন শামসুর রহমান। কে তিনি?

৫. রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন কোন্ বিখ্যাত সাংবাদিক?

উত্তর : ১. ১৮৭৩-১৯৬০। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমথনাথ চৌধুরী। ২. ১৮৯৬-১৯৮০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ৩. আবু সয়ীদ আইয়ুব। রবীন্দ্রনাথ। ৪. বাংলা ভাষার লেখক কবি। ৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষসূচনায় শপথ

স্বাগত নতুন বছর

তারক সাহা

বছর যায়, বছর আসে—একই নিয়ম মেনে,
চলে হানাহানি, রক্তপাত—হিংসার জের টেনে।
পুরনো বছর ছিল শুধুই সন্ত্রাসে ভরা—
নতুন বছরে তেমনই থাকবে ধরা?
আলো আনন্দ পৌঁছে যাক সকলের ঘরে
‘মানুষের জয় হোক’ বলবো সমবেত স্বরে।
ছিল যত সব প্রশ্ন, নতুন উত্তর খোঁজা চলুক
কাজ আর কথা এক হয়ে অন্য কিছু বলুক।

সাহস শ্রম নিষ্ঠা নিয়ে ছুটতে হবে জোরে
অনেক কিছু আসবে তোমার আমার দোরে।
সকলের কথা ভাববো সবাই মন রাখবো খুলে,
পুরনো ভুল শুধরে নিয়ে মাতবো খুশিতে দুলে
শত্রু মিত্র মিলবো সবাই নতুন দিনের সাজে—
সব বাধাই পেরিয়ে যাবো মনভরানো কাজে।
খরা নয়, জরা নয়, হিংসায় ঝরবে না আর রক্ত
দেশের কাজে নামতে হবে মনকে রেখে শক্ত।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী

সুতপা বসাক ভড়

"মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনো বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারিবেও না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।" —ভারতীয় নারী।

"কোন শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হইবে না? ভারতের অধঃপতন হইল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদ পাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিলেন; সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন, নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন! এইসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল তখন, এখনই বা মেয়েদের সেই অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবার ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ।" —স্বামী-শিষ্য সংবাদ।

"ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাবপ্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ-স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।" —রামকৃষ্ণানন্দকে ৭৩, ১৮৯৫, পত্রাবলী।

"প্রভু বলিয়াছেন, 'ত্বং স্ত্রী; ত্বং পুসানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী' —তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী। আর আমরা বলিতেছি... 'কৈনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী'— কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে!" —রামকৃষ্ণানন্দকে ৭৩, ১৯.৩.১৮৯৪, পত্রাবলী।

"সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও, প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তি সাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।" —ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা, বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড।

"যীশুখৃস্ট নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেননি। স্ত্রীলোকেরাই তাঁহার জন্য সব করিল, কিন্তু তিনি ইহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি প্রেরিত শিষ্যা পদে উন্নীত করেনি। বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন, আর তাঁহার নিজের স্ত্রীই তাঁহার প্রথম ও একজন প্রধানা শিষ্যা, তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হইয়াছিলেন।" —দেববাণী

"প্রাচীনকালে গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোনো ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না— ধর্মকার্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই— সেই জন্যই পত্নীর একটি নাম সহধর্মিণী, যাহার সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম-কার্যানুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু স্ত্রী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত ধর্মানুষ্ঠানে তাঁহার কর্তব্যটুকু না করিলে কোনো ধর্মানুষ্ঠানই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।" —ভারতীয় নারী

"নারীদের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও সে যোগ্যতালাভে সমর্থ। তোমাদের নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা তোমাদিগকে বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?" —ভারতীয় নারী— তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বাণী ও রচনা ৯ খণ্ড।

"মনু বলিয়াছেন—

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের— সে দেশের উন্নতির আশা নাই।

সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ। হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে এইরকম শিক্ষা চাই। ওইরকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। ...বীরত্বের ভাবটাও দেখা দরকার। এসময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিলেন!" —ভারতীয় নারী

"...এখন ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে।" —ভারতীয় নারী

"ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ। ...মহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ। ...আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা চলিতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে— ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।" —ভারতীয় মহাপুরুষগণ, বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড। ■

অপ্রাসঙ্গিক আইনকে বিদায় দিতে হবে

মুজফ্ফর হুসেন

আপনি জানেন কি যে মধ্যপ্রদেশের আইনগ্রন্থে আজও বিনা খরচে বিদেশযাত্রার উল্লেখ আছে? মধ্যপ্রদেশে বসবাসকারী যে কেউ যদি লন্ডনে যেতে চান, তাহলে মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁর সমস্তরকম ব্যয়ভার বহন করতে আইনানুগ বাধ্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর একজনও নাগরিক পাওয়া যাবে না যিনি বলতে পারেন ইংল্যান্ড ভ্রমণের জন্য সরকারের থেকে পয়সা পেয়েছেন। এরকম কোনো উদাহরণ নেই, এমনকী আদালতের দ্বারস্থ হলেও মধ্যপ্রদেশ সরকার এক পয়সাও দেবে না। যখন এরকম কোনো সুযোগই পাওয়া যাবে না তাহলে আইনগ্রন্থে এরকম ধারার আবশ্যকতা কোথায়? বিনা খরচে বিদেশযাত্রার বিষয়ই কেবল নয়, দেশে এমন অসংখ্য আইন আছে যা এ সময় কোনো কাজেই লাগছে না বা ব্যবহারও করা হচ্ছে না। সেজন্য অতি সাধারণ মানুষেরও মনে হচ্ছে যে, এরকম আইন থাকারই বা প্রয়োজন কোথায়? দেশে অথবা কোনো রাজ্যে কোনো আইন তৈরি করা কঠিন কাজ এবং

> **চেন্নাইয়ে একজন বিচারপতিকে ধুতি পরার কারণে একটি অনুষ্ঠানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে তামিলনাড়ু সরকার একটি আইন পাশ করে পোশাকের ওপর বিধিনিষেধ বাতিল করে দেয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও আইন করে পোশাক-বিধি তুলে দিতে হচ্ছে— এ বড়ই বেদনার!**

দীর্ঘ প্রক্রিয়া, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার থেকেও কঠিন কাজ এসব অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলিকে বাতিল করা। অসংখ্য এরকম আইন আছে যেগুলির আধুনিকীকরণ খুবই জরুরি। কিন্তু আমাদের আইনপ্রণেতা ও আইনবিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে কখনো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতার পর দেশে অনেক রাজ্য তৈরি করা হয়েছে। সে সময় সরকার ও আমলারা যদি সক্রিয় হতেন তাহলে নতুন রাজ্য তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এসব অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলিও কলমের এক খোঁচায় সমাপ্ত হতে পারতো। এখন অবস্থা খুবই খারাপ। মোদী সরকার এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এই প্রথম সরকার যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দু'তিন বছরের মধ্যেই এ বিষয়ে সুপরিণাম দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন এসব অপ্রাসঙ্গিক আইন আর দেশে দেখা যাবে না। মধ্যপ্রদেশের নাগরিকদের বিনা পয়সায় ইংল্যান্ড যাত্রার আইনি অধিকার ১৮৭৮ সালে তৈরি এক আইনের দ্বারা এসেছিল। সে সময় রাস্তায় টাকা পড়ে থাকতে দেখে যদি সরকারকে না জানানো হোত তবে জেল অথবা জরিমানা ভোগ করতে হোত। সেরকম ১৯৩৪ সালে এক আইন আনা হয় যে, ঘুড়ি তৈরি, উড়ানো অথবা বিক্রি করার জন্য সরকারের অনুমতি আবশ্যক।

অতিথি কলম

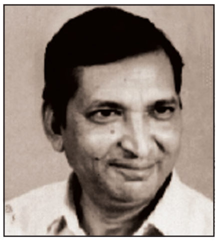

মুজফ্ফর হোসেন

ক্যারাভানসরাই (সরাইখানা) অ্যাক্ট-১৮৮৭ অনুসারে যে কোনো হোটেল অথবা সরাইখানায় যে কোনো ব্যক্তি নিঃশুল্ক পানীয় জল ও শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে। যদি এই আইনে দম থাকতো তাহলে কি আমরা কোনো রেল স্টেশনের পাশে খোলাজায়গায় নারী-পুরুষদের অশালীনভাবে স্নান অথবা শৌচকর্ম করতে দেখতে পেতাম? এজন্যই অবশ্য কেউ কেউ ইংরেজ আমলের আইনের প্রশংসা করে থাকেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল যে, পুরনো ও অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলিকে বাতিল করা হবে। কিন্তু এত বছরেও এরকম কিছু হয়নি। বরং সেগুলি এখনো আমাদের আইন-পুস্তকে মাথা উঁচু করে আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার পর আমাদের দেশের শাসনকাজ দেশের সংবিধান অনুসারে চলা স্বাভাবিক। সংবিধান সভা ও আইন মন্ত্রালয়ের এ বিষয়ে স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিককালের এই আইনগুলি আজও আইনশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবে টিকে আছে কেন এটা বোধশক্তির অতীত। নতুন আইন তৈরি করা কঠিন, কিন্তু পুরনো আইন বাতিল করার মধ্যে কোন কঠিনতা আছে? লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে এ বিষয়ে কথা বলা নিষেধ আছে? লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে ধ্বনিভোটে এক নিমেষেই আইনগুলিকে বাতিল করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনদেশের লোকসভা ও বিধানসভাগুলিও এই কাজটি করতে পারেনি। দেশের সমস্ত আদালতেই আইনজীবী এবং বার অ্যাসোসিয়েশন

আছে। তাঁরা যে ক্ষেত্রে কাজ করেন, স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব এসে যায় সময় থাকতেই গম্ভীর বিষয়গুলি উত্থাপন করার। কংগ্রেস সরকার এ কাজ করার সময়ই পায়নি, কিন্তু বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতায় এসে সংসদে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল।

সংসদ তো পরের কথা, নিজেদের বিধানসভায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা রাজ্যগুলিও কখনো ভাবেনি, এখনো কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। এজন্য এই দেশে নতুন আইন তৈরি করা ও চালু করা শুধু কঠিন নয়, বরং পুরনো ধ্বংসাবশেষকে ভেঙে ফেলাও বেশ কঠিন। যদিও কয়েকটি সংবাদপত্রে একটি খবর দেখা গিয়েছিল যে, মোদী সরকার বেকার আইনগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেছে যাতে যত তাড়াতাড়ি এগুলি বাতিল করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই আদেশ যেতেই মন্ত্রীরা নড়েচড়ে বসেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সদর্থক পরিণাম সামনে আসেনি। কেননা পুরাতনের জায়গায় নতুনকে গ্রহণ করা যত কঠিন, ততটাই কঠিন পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ কমানো। জানা যাচ্ছে যে, মোদী সরকার এই অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলি বাতিল করার জন্য রামানুজনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। সমস্ত মন্ত্রালয় থেকে তথ্য পাওয়ার পর এ বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে দেরি হবে, কিন্তু এটা সঠিক দিশায় বাজপেয়ী সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রথম ধাপ। পাঠকের মনে থাকতে পারে— দীর্ঘ সময় বাদে আবার এই পুরনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাজপেয়ী সরকার এ বিষয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার পরিণামেই ৪১৫ আইন বাতিল করা হয়েছিল। বাজপেয়ী সরকারের পর মোদী সরকার এ বিষয়ে বিচারবিমর্ষ শুরু করে দিয়েছে।

আইনের বিষয় হওয়ায় 'ধীরে চলো' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনিবার্য, কিন্তু সরকারের এই মনোভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, এবিষয়ে তারা খুবই সচেতন। আইন কমিশনও এ বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে। তাদের মতে, এ বিষয়টি তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধাপে ধাপে রিপোর্ট তৈরি করা হবে এবং যোজনাবদ্ধ ভাবে বিষয়টি শেষ করা হবে। রিপোর্টে আইন কমিশন এটাও বলেছে যে, আগে অনেক আইন পাশ করানো হয়েছিল যার এখন কোনো ভূমিকাই নেই। কেননা আইন তৈরি করা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারেই। এখন যদি সেই আইনের কোনো উপযোগিতা না থাকে, তাহলে আইন কমিশন এক নিমেষেই জনতাকে সেই আইন থেকে মুক্তি দিতে পারে। সবচাইতে প্রয়োজন আদালতের কাজকর্মকেও ঔপনিবেশিক ধাঁচা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সক্রিয় হওয়া। এই কারণেই জনতার ওপর নানাবিধ করের বোঝা চেপে যাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল করার প্রক্রিয়া যত দ্রুত হবে, আইনের ক্ষেত্রে আর্থিক বোঝা থেকে জনতা তত দ্রুত মুক্তি পেতে পারবে। ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এরকম অনেক ছিদ্র আছে, যার দ্বারা অকারণে জনতার ভোগান্তি হয়। আইন সরল হোক, প্রাসঙ্গিক হোক এবং মানুষের জন্য সুলভ হোক— তাহলেই আমজনতা সুখে থাকতে পারবে। সরকারের এই পদক্ষেপে মনে হচ্ছে যে, অকারণ বিষয়গুলি যদি বাতিল করা যায়, তাহলে মানুষ আর্থিকভাবে লাভান্বিতও হবে। মানুষের আইনের সঙ্গে পরিচয় থাকা জরুরি। ফলস্বরূপ তাদের অকারণ অর্থব্যয় লাঘব হবে। আদালতে কালো কোটই শুধু চোখে পড়ে না, টাকার কানাগলিতে গরিব মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে।

উচ্চ আদালতের সওয়াল-জবাব অধিকাংশই ইংরেজিতে হয়। সেজন্য অতি সাধারণ ব্যক্তি আইনের যথার্থতা থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকে। আজকাল হিন্দীকে সরকারি কাজে ব্যবহারের ভাষা বলা হলেও অনেক রাজ্যে তা মানা হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ জানতেই পারছে না সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজি আজও অসংখ্য সরকারি কর্মচারী ও বিচারকদের কাছে মহামূল্যবান ভাষা। গ্রামের কোনো গরিব মানুষের গোরু কেউ জোর করে নিয়ে গেলে ভেবেই পায় না ফিরে পাওয়ার জন্য সে কোথায় এবং কার কাছে যাবে। থানা বা আদালতে গেলে বেচারা গোরুর মালিক অসহায় হয়ে পড়ে। সেখানে যেনতেন প্রকারে দালাল ও কষাইরাই জিতে যায়। এজন্য আইন শুধু সরল হওয়াই নয়, বরং তা সাধারণ ভারতবাসীর বোধগম্য হওয়াও প্রয়োজন। রায় যদি প্রাদেশিক ভাষায় লিখে দেওয়া যায় তবে ইংরেজি না জানা লোকেদের ভয় কেটে যাবে।

আদালতকে দেশবাসী সম্মান জানাতে চায়, কিন্তু ন্যায়দানকারীরাই ওই ভাষা বুঝতে পারেন না। সেজন্য হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকভাষা ব্যবহার হলে সবাই বুঝতে পেরে লাভবান হবেন। গরিব, অশিক্ষিত এবং গ্রামের লোকও আদালতের ভাব ও ভাষা বুঝতে পারবেন। বিচারক মহাশয় প্রাদেশিক ভাষাকে উপেক্ষা করার জন্য তামিলনাড়ুর মাদুরাই ডিভিশন বেঞ্চের আইনজীবীরা অনেকদিন পর্যন্ত ধর্মঘট করেন। পাঠকের মনে থাকতে পারে যে, চেন্নাইয়ে একজন বিচারপতিকে ধুতি পরার কারণে একটি অনুষ্ঠানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে তামিলনাড়ু সরকার একটি আইন পাশ করে পোশাকের ওপর বিধিনিষেধ বাতিল করে দেয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও আইন করে পোশাক-বিধি তুলে দিতে হচ্ছে— এ বড়ই বেদনার!

তামিলনাড়ুতে সরকার, প্রশাসন, লেখাপড়া এবং আদালতের কাজকর্মে আজও ইংরেজির বাড়বাড়ন্ত চলছে। এ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই করা হয়নি। এজন্য সময়ের দাবি অনুসারে আদালত ও আদালতে ভাষার ওপর খোলামনে চর্চা হয়ে যদি কোনো আইন তৈরি হয় তাহলে মানুষ আইনকে আরো বেশি সম্মান জানাবে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে গণতন্ত্র ও স্বদেশীভাবের জয়জয়কার হবে। আইন সবার জন্য সমান। সহজ, সরল ও জনতার ভাষায় তৈরি করা আইন- কানুন এখন পুরোদমে চালু করা প্রয়োজন। তা না হলে প্রশ্ন উঠবে— আইন কিসের জন্য? আমজনতার ভাষাই একমাত্র আইনকে রক্ষা করতে পারে।

বঙ্গ রাজনীতিতে মমতার দুঃসময়

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সংসদে রাজ্যসভার সদস্য কুণাল ঘোষ (তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত এমপি)-কে গত বছর ২৩ নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে। এই কাণ্ডে জড়িত প্রভাবশালীদের নিয়ে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন কুণাল। অতি সম্প্রতি নগর দায়রা আদালতে এজলাসে দাঁড়িয়ে কুণাল প্রকাশ্যেই হুমকি দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা না হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। সেই মতো তিনি গত ১৪ নভেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিজের সেলে বেশ কিছু ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। কিন্তু পুলিশ তাঁকে

মদন

মমতা

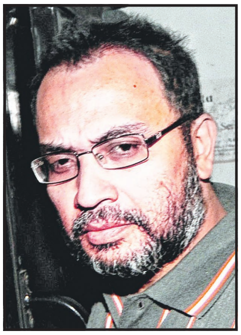

কুনাল

মরতে দেয়নি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুণালকে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁর জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশেই চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এই কুণাল ঘোষই আবার বিচারকের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়ের সম্পর্কে সারদা কাণ্ডে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে সিবিআইকে তাঁর বয়ান রেকর্ডের যে আর্জি জানান তা গৃহীত হয়েছে। বিচারক সিবিআইকে জেলে গিয়ে অভিযুক্ত জেলবন্দি কুণাল ঘোষের বয়ান রেকর্ড করার নির্দেশ দেওয়ায় দারুণ চাঞ্চল্য এখন বঙ্গ রাজনীতিতে।

অতঃপর সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এবার গ্রেপ্তার হলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন ও ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র। সিবিআই দীর্ঘ পাঁচঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেপ্তার করে গত ১২ ডিসেম্বর। ২০০৮ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক ছিলেন মদন মিত্র। সারদার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া, সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে সুসম্পর্ক, এমনকী যারা নিয়মিত সারদার টাকা পেয়ে থাকেন, সেই সব প্রাপকদের তালিকায় মদন মিত্রের নাম রয়েছে, এমন অভিযোগ ওঠার পরপরই মদন মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হলো বলে জানায় সিবিআই।

মদন মিত্রকে গ্রেপ্তারের পরপরই রাজ্য সরকারের সচিবালয় নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-র তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। বিজেপি-র কথামতো সেন্ট্রাল ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) কাজ করছে।' বর্ধমানের খাগড়াগড়ে ২ অক্টোবরের বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পশ্চিমবঙ্গের সর্বজন দিদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুদীপ্ত সেনের মালিকানাধীন সারদা কেলেঙ্কারির ঝড় এবং নিজ পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রের গ্রেপ্তারের ঘটনায় স্মরণকালের সবচাইতে বিশাল ঝুঁকিতে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষনেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কোন দিকে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী সেই পথ খুঁজতে হচ্ছে এখন। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা তৈরি, মাদ্রাসা খুলে দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ইউনিট তৈরি এবং দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে জেহাদি জঙ্গির নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডের ঘটনাবলি যতই উন্মোচিত হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁপুনি ততই বাড়ছে। ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তার 'শত্রু' চিনতে মমতার অক্ষমতা ও নির্লিপ্ততাকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি এখন বড় করে দেখছে। জঙ্গিগোষ্ঠীকে সীমাহীন পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া মমতা এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন। হারানো রাজ্য ফেরত পেতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও এখন কম যাচ্ছে না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্যের কোনো দলের সঙ্গেই মমতার এখন সুসম্পর্ক নেই যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। বহুমুখী ঝামেলা ঠেকাতে অনেকটা বাধ্য হয়েই সোনিয়া গান্ধীর আমন্ত্রণে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে যোগ দিতে দিল্লী গিয়েছিলেন মমতা। অন্তত কংগ্রেসকে যদি সঙ্গে পাওয়া যায় এই দুর্দিনে এই আশায়। উষ্ণ আতিথেয়তার কোনো অভাব না থাকলেও তাঁর উপস্থিতির অতটা গুরুত্ব দেননি সোনিয়া গান্ধী। ফলে অনেকটা বিফল মনোরথে ফিরে এলেন কলকাতায়। সোনিয়া গান্ধী ভুলে যাননি ২০১১ সালের কথা। কংগ্রেস ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বড় ইচ্ছে ছিল ঢাকা সফরের সময় সীমান্ত ও তিস্তা চুক্তি দু'টি চূড়ান্ত করে ফেলার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢাকায় নিয়ে আসার সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। মমতাকে যে কতখানি গুরুত্ব সে সময় দেওয়া

হয়েছিল, তা মমতা বুঝলেন না তিনি গোঁ ধরলেন, তিনি ঢাকা আসবেন না। ফলে যা হবার তাই হলো। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বাঁধন প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। গত বছর সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে সীমান্ত চুক্তি বিলটা রাজ্যসভায় পেশ করা হবে বলে ঠিক হলো। মমতা তাঁর দলের রাজ্যসভার সদস্যদের ফোন করে বলে দিলেন, প্রাণ যায় যাক, বিল যেন মন্ত্রী পেশ করতে না পারেন। বিলটি সেদিন রাজ্যসভায় পেশই করতে পারলেন না পূর্বতন ইউপিএ সরকারের প্রধান শরিক কংগ্রেসের বিদেশমন্ত্রী সালমান খুরশিদ। বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও অসম গণপরিষদের সদস্যরা সেদিন ঘিরে ফেলেছিলেন সালমান খুরশিদকে। বিলটি সেদিন পেশ করা হলো না মমতার কারণেই। সেই মমতার গলায় এখন সারদা কেলেঙ্কারির ফাঁস চেপে বসেছে। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো জেঁকে বসেছে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বোমা বিস্ফোরণ। ‘ভাঙব তবে মচকাবো না’ গোছের মমতার এখন বড় দুঃসময়। তবুও তিনি হুঙ্কার ছাড়তে একটুও পিছপা নন। রাজ্যসভার অধিবেশনের পূর্বে সর্বদলীয় সভায় যোগ না দিয়ে তিনি কলকাতার রাজপথ গরম করেছেন। ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গুরু’ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকে পুনঃ আখ্যায়িত করে তার পুরনো ভাবমূর্তিতে নতুন করে রং দিচ্ছেন। দুর্গাপূজার সময় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগানোর লক্ষ্যে ‘র’-এর সহায়তায় বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বোমা ফাটানো হয়েছে বলে ‘র’ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। নিজ রাজ্যে জঙ্গির অবস্থান এবং নিরাপত্তা শিথিলতার দায়ভার কেন্দ্রের সরকারের নিয়ন্ত্রিত সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) উপর চাপিয়ে তিনি নিজেকে হাল্কা করতে চাইছেন। তাঁর মতে বিএসএফ নাকি বাংলাদেশ থেকে আগত জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ নাকি খাগড়াগড়ে বোমা বানানোর আয়োজন করে দিয়েছে। মুখে যতই কথা বলুক মমতা সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক এবং তৃণমূল সাংসদের গ্রেপ্তার হওয়া মমতাকে ভাবিয়ে তুলেছে। গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ ইতিমধ্যেই সারদা কেলেঙ্কারির বড় সুবিধাভোগী বলে মমতাকে একাধিকবার আক্রমণ করেছেন। এখন মদন মিত্র কি বলেন সকলের দৃষ্টি সেই দিকে। সিপিএমকে রুখতে গিয়ে রাজনীতির যে পাশা খেলায় জঙ্গিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতে মমতা শুরু করেছিলেন, সেই খেলায় মমতা এখন নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছেন।

অনগ্রসর মুসলমানদের দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক গড়ে এবং মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে গোপন সংখ্যা নির্বাচনে ভালো ফল এনে দিলেও এখন সেটাই হয়েছে মমতার গলার কাঁটা। এতদিন মমতার যে ভাবমূর্তি ছিল তা আজ বিপন্ন। হুঙ্কার দিয়ে বা বিজেপি-র উপর দোষ চাপিয়ে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন ভাবমূর্তি উদ্ধার করা যাবে না। বিপন্নভাবমূর্তিকে রক্ষা করতে হবে মেধা দিয়ে। বিজেপি-র সঙ্গে এক্ষেত্রে কৌশলগত সখ্যতাই মমতার অনেক কাজে লাগবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। ■

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com www.pioneerpaper.co

নেত্রদান মহাদান
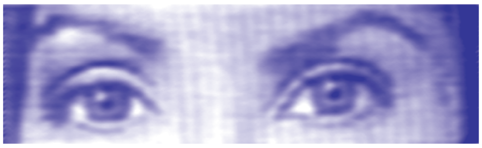
EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

অসমে জনজাতি হত্যা ষড়যন্ত্রের গভীরে খৃস্টান সংগঠন

গুয়াহাটি থেকে হরিমোহন দাস॥ সময়টা বিকাল সাড়ে পাঁচটা। স্থান— অসমের শোণিতপুর জেলার স্কুলবাড়ী গ্রাম। স্কুলের মাঠে ছোট্ট শিশু বেলাই হেমরম (১০) খেলাধুলা করছিল তার সঙ্গীসাথি কল্যাণী হেমরম (৮), লক্ষ্মণ মুর্মু (৫), সঞ্জিলা হাসদা (৭), মঞ্জিলা হাসদাদের সঙ্গে। হঠাৎই তারা সবাই দেখলো ১২ জন পুলিশ কাকু তাদের গ্রামে ঢুকছে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল ওই পুলিশ কাকুগুলো তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। তা দেখে বেলাই ও তার সঙ্গীসাথীরা দৌড়াতে শুরু করে। তাদের পিছনে পিছনে পুলিশকাকুরাও দৌড়াতে শুরু করে। তারপর ওই পুলিশকাকুর দল এ.কে ৪৭ দিয়ে ওই শিশুগুলির দেহ গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়। রক্তে ভেসে যায় স্কুলবাড়ি গ্রাম। আসলে ওই শিশুগুলি বুঝতেই

জাতিদাঙ্গায় পুড়ছে ঘরবাড়ি।

পারেনি ওই পুলিশের পোশাক পরা কাকুগুলি নরখাদক, নরপিশাচ, উগ্রপন্থী। এন ডি এফ বি (এস)-এর সদস্য যারা অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক সোনবাহিনীর পোশাক পরে সাদাসিদে, সরল, নিরাপরাধ, নিরীহ, গোবেচারা, শান্তসুলভ ২০০ জনেরও বেশি জনজাতি মানুষকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। পরিকল্পনা মাফিক এই জন্য যে সমস্ত ঘটনাটাই ২৩ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে অসমের শোণিতপুর জেলা থেকে কোকরাঝাড় জেলার শান্তিপুর পর্যন্ত একটার পর একটা আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। যে আক্রমণে অবুঝ শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও বাদ যায়নি। যার স্বরূপ এতটাই নির্মম যে তা ভাষায় বলা বা লেখা এক কঠিন কাজ।

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন শোণিতপুর জেলার পাঙবৈতে ৩৫ জন জনজাতির চিতা সাজানো হয়েছে যাদের মুখে আগুন দেওয়ার কেউ নেই। কারণ এদের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। তাই গ্রামবাসীই সাজানো চিতায় মুখাগ্নি করে। এই চিতাতেই শুয়ে আছে ২ বছরের সুখী বাস্কে, সে যখন মায়ের দুধ পান করছিল তখন তার মা ও তাকে একসঙ্গে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এদের মধ্যেই ২৪ জনের চিতা আছে যাদের মুখের মধ্যে এ. কে. ৪৭ ঢুকিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। এই চিতার মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে সংগল বাগ্দী, তার স্ত্রী, দুই শিশুকন্যা ও এক শিশুপুত্র যাদেরকে একইভাবে মুখের মধ্যে বন্দুক ঢুকিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোকরাঝাড় জেলার উল্টাপানীতে ৩০ জন জনজাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় করে একসঙ্গে হত্যা করেছে উগ্রপন্থীরা। যার পরিণামে অসম জ্বলছে, জনজাতিদের ঘর জ্বলছে, ধীরে ধীরে সামনে আসছে লুকিয়ে রাখা অনেক মৃতদেহ। কোকরাঝাড়ে দুই হিন্দু জনজাতি ও বোড়োদের মধ্যে শুরু হয়েছে জাতিদাঙ্গা। ২ লক্ষ মানুষ ঘর হারিয়ে একশো'টা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত অসমের বিটিএডি (Bodoland Territorial Area District) অঞ্চলে। কোকরাঝাড়, শোণিতপুর-সহ ৯টি জেলা নিয়ে গঠিত এই বিটিএডি। আক্রমণের কেন্দ্রস্থল ছিল অসম-অরুণাচল সীমান্ত ও অসম-ভুটান সীমান্ত অর্থাৎ অসমের উত্তরপ্রান্ত যাকে অসমিয়ারা বনাঞ্চল নামে জানে। বনের উপর যাদের অধিকার তাদেরকেই বনাঞ্চল থেকে উৎখাত করতেই আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু কেন, তারা কী দুর্বল বলে? অসমেও ওরাঁও, মুণ্ডা, তাঁতি, ভূমিজ, গোয়ালা সব মিলে ১০ লক্ষ জনজাতি আছে যারা বেশিরভাগই চা শ্রমিক, দিনমজুর। আর তাদের উপর যারা আক্রমণ করলো সেই এন. ডি. এফ. বি. (National Democrratic Front of Bodoland) হলো বড়ো রাজ্যের দাবিদার এক উগ্রবাদী সংগঠন। প্রশ্ন হলো— রাজ্য চাই তো উগ্রবাদ কেন? কেনই বা হিন্দু জনজাতিদের মারা? আসলে এর পেছনে রয়েছে খৃস্টান সংগঠনের ষড়যন্ত্র। এন ডি এফ বি উগ্রবাদী সংগঠনটির দু'টি গ্রুপ— একটা এন ডি ই বি (এস) এবং অন্যটি এন ডি এফ বি (আর)। প্রথমটার প্রমুখ আই কে, সংবিজিত ও দ্বিতীয়টার প্রমুখ রঞ্জন দইমারী। এরা দু'জনেই খৃস্টান এবং দুই সংগঠনের সব সদস্যও খৃস্টান এলাকায়। প্রভাব বিস্তার করার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড। আই কে সংবিজিত কার্বি জনজাতির যুবক। সে খৃস্টান হয়ে এন ডি এফ বি (এস) নামে উগ্রবাদী সংগঠনের প্রমুখ হয়ে ওঠে এবং ঠাণ্ডা মাথায় নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দু জনজাতিদের হত্যা করে। খৃস্টান সংগঠনগুলি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য গত বছরই বোড়োল্যান্ড খ্রাইস্ট নামে

লিফলেট বিলি করেছে। একইভাবে তারা Nagaland Christ, Meghalay Christ, Manipur Christ নামেও লিফলেট বিলি করেছে।

এন ডি এফ বি-এর কাজই হলো মানুষকে অপহরণ করে টাকা দাবি করা। আর তা না পেলে হত্যা করা। এভাবেই তারা এর আগে ৭২ জনকে হত্যা করেছে। এবার তারা জনজাতিদের বেশ কয়েকদিন ধরেই হুমকি দিয়েছিল। এই হুমকির কথা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা অসম সরকারকে জানানো সত্ত্বেও অপদার্থ গগৈ সরকারের অকর্মণ্যতার জন্য অসমের ইতিহাসের সবচেয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হলো। এই বিটিএডি এলাকায় এতদিন পর্যন্ত বোড়ো জঙ্গির সঙ্গে সরকার ও মুসলমান সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিনের লড়াই চলছিল ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু খৃস্টান এন ডি এফ বি জনজাতিদের আক্রমণের ফলে লড়াই রূপান্তরিত হলো বোড়ো ও জনজাতিদের মধ্যে যা হিন্দু সমাজের ঐক্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট ফাটল। এখন বোড়োরা এক হয়ে জনজাতিদের ঘর জ্বালাচ্ছে। আবার অন্যদিকে জনজাতিরা একজোট হয়ে বোড়োদের ঘর জ্বালাচ্ছে। যার ফলে সমগ্র কোকড়াঝাড় জেলা জ্বলছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ হিন্দু সংগঠনগুলি জোরকদমে নিঃসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে যাচ্ছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কারণ সরকারি শিবিরগুলি খৃস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করার একটা উত্তম জায়গা। অতীতেও শরণার্থী শিবিরগুলিতে হাজার হাজার মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি জনজাতিকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

আশার কথা, ঘটনার পরে পরেই আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ অসমে এসেছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে উগ্রবাদী সাফাই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন, ঘটনার এন আই এ তদন্তের কথা বলেছেন। কিন্তু যে তদন্ত অত্যন্ত জরুরি তা হলো এন ডি এফ বি মতো সমস্ত উগ্রবাদী সংগঠনের হাতে টাকা কোথা থেকে আসছে, অস্ত্র কোথা থেকে আসছে তার উৎসসন্ধান করা। ভুটান, বাংলাদেশ বা মায়ানমার হোক— কেন দেশের সীমানা পেরিয়ে এদের হাতে এ.কে ৪৭ আসছে তা তদন্ত করে দেখতে হবে। খতিয়ে দেখতে হবে খৃস্টান প্রভাবিত জেলগুলির ভূমিকা, মুসলমান সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিনের ভূমিকা। তারপর এন জি এফ বি (এস) যে ২৫০ জন সদস্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের যথাযথ শাস্তি দিতে হবে। ইংরেজ আমল থেকেই এই অঞ্চলে খৃস্টান সংগঠনগুলি যে প্রভাব বিস্তারের কাজ করছে এবং তার জন্য তারা প্রতি বছর যে রেজিস্ট্রেশন করে, সেই রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র সরকারকে বাতিল করে দিতে হবে। জনজাতিদের হত্যার সব খবর থাকা সত্ত্বেও কেন অসম পুলিশ ১২ ঘণ্টা পরেও ঘটনাস্থলগুলিতে পৌঁছতে পারলো না, উল্টে প্রতিবাদী সংগঠনগুলি আক্রমণ চালিয়ে ফের কেন জনজাতিদের প্রাণ নিল তারও তদন্ত করে অসম সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। অসমের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলিই আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মা কামাখ্যার ভূমিতে হিন্দু হিন্দুর রক্তে কেন হোলি খেলল? কেন হিন্দু হিন্দুর রক্ত হাতে মাখলো আর যার নেতৃত্ব দিল খৃস্টান ও মুসলমান সংগঠনগুলি— তারও তদন্ত করতে হবে। আজ অসমীয়া হিন্দু সমাজকে সাহায্য করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। না হলে যে অস্থিরতা, অরাজকতা ও অনৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে অসমে হিন্দু সমাজের বাঁচা কঠিন হয়ে উঠবে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে

বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন

দিনাঙ্ক : ২২ মার্চ ২০১৫, রবিবার

সকাল ৮-৩০ থেকে বিকাল ৪-৩০

স্থান : কেশব ভবন,

৯এ অভেদানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা-৬

প্রতিনিধি শুল্ক : ৩০০ টাকা

যোগাযোগ:

ডাঃ জে. কুণ্ডু — ৯৪৩৩৮২০১৮৫
ডাঃ এন. অধিকারী — ৯৮৩১৭১০৭৮৮
ডাঃ পি. কুণ্ডু — ৯৮৩১৪৯১৬৫৮
ডাঃ বি. ঘোষরায় — ৯০৬২০৩৪৮৯১
ডাঃ এ. চৌধুরী — ৯৬৪৭৬৫৬২৪৫

মৈত্রেয়ী গুরুকুলম্

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। মহিলাদের প্রসঙ্গে এই কথাটা প্রায়শই শোনা যায়। কারণ ভারতীয় সভ্যতায় মহিলারা হাজারো গুণের অধিকারিণী। তারা একাধারে যেমন— মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী রূপে বিরাজ করছে, তেমনি জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে আসছে। একটি শিশুর কাছে প্রথম গুরু তার মা। দেশের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হতে তিনিই তাকে সাহায্য করেন। এরকমই দায়িত্ববান নাগরিক গড়তে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। মৈত্রেয়ী গুরুকুলম্ নামে এই সংগঠন মহিলাদের নতুন করে শিক্ষিত গড়ার কাজে নেমেছে। কারণ আমাদের পরম্পরা যেখানে হারিয়ে যেতে বসেছে বৈদিক শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের কাছে তা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার মুরুকাজি গ্রামে, ভিট্টালা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার

মৈত্রেয়ী গুরুকুলের আশ্রম।

দূরে এই মৈত্রেয়ী গুরুকুলম্ অবস্থিত। মূলত গুরুকুলমের মাধ্যমে মহিলাদের বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি বালিকাদের ভবিষ্যৎ সুগঠিত করতে গুরুকুলম্ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে আদর্শ সমাজ গঠনে এক কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে মহিলারা। প্রধানত কর্ণাটকের হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানমের মাধ্যমে স্থানীয় এক ট্রাস্টের উদ্যোগে মৈত্রেয়ী গুরুকুলম্ চলে। সেখানে কোনোরকম টাকা-পয়সা ছাড়াই ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়। এমনকী থাকা-খাওয়াও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। কারণ শিক্ষাদানের নামে ব্যবসা চায় না গুরুকুলম্। এটি সাধারণ মানুষের দানধ্যানের উপর নির্ভর করেই চলে। মানবদরদি এক সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই গুরুকুলমের প্রকল্পগুলি চলছে। গুরুকুলমের বেশিরভাগ মেয়েই গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আসে। ১০ বছরের উপর যাদের বয়স সেই সমস্ত মেয়ের কোনো জাতধর্ম বিচার না করে এখানে ভর্তি করানো হয়। গুরুকুলমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানকার পড়াশোনা মাতৃভাষা কন্নড়েই হয়ে থাকে। কাজের ক্ষেত্রে কথাবার্তা সংস্কৃতে হয়।

আধুনিক প্রযুক্তি ও পরম্পরার মিশেল ঘটিয়ে পড়ানো হয়। বেদ, যোগ, কৃষি, ওষুধপত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়েও বিভিন্ন ক্লাস হয়ে থাকে। গুরুকুলমের প্রধান বৈশিষ্ট্য মেয়েদের বেদ পাঠদানের মাধ্যমে পরম্পরার ছোঁয়া রাখা হয়। এছাড়াও যাঁরা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকেন তারাও মায়ের পরশ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আবার অন্যান্য সুবিধার মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ফাইন আর্টস-এরও ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি শ্রেণীতে থাকে ২০ জন করে ছাত্রী। শ্রেণীকক্ষে গুরু বসেন একটু উঁচু জায়গায় আর শিষ্যরা বসে মাটিতে আসন পেতে। ক্লাসরুমে থাকে না কোনো ব্ল্যাকবোর্ড, চক। এখানে শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় ছ'বছরের কোর্সের মাধ্যমে, যা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে সাহায্য করে।

তবে এই গুরুকুলম্ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে মহিলা সর্বদিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কথা বলতেই হয়। প্রায় দু'দশক আগে, এক প্রবীণ দম্পত্তি যাঁদের প্রায় ১০০ একর জমি, বর্তমানে যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। ২০০টি কুকুর নিয়ে সুখে বসবাস করতেন তাঁরা। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর প্রবীণ মহিলা ঠিক করেন তিনি তাঁর এই জমি কোনো এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে দান করবেন। যাঁরা মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করবেন। তিনি তাঁদের উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এই জমি। সেই মতো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক কার্যকর্তাকে তিনি বলেন। কিন্তু কার্যকর্তা তা শোনা মাত্রই প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এই বিশাল পরিমাণ জমি তত্ত্বাবধান করার জন্য যে পরিমাণ লোকজনের প্রয়োজন তা তাঁর হাতে ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন এই নমস্য মহিলা তার জমির সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে কার্যকর্তার হাতে তুলে দেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি স্বর্গযাত্রা করেন। কার্যকর্তা তাঁর দলবলকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে সেই মহিলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এবং সর্বশেষে এটাই বলা যায় তাঁর আত্মা শান্তি পেয়েছে, কারণ তিনি এক সঠিক লোকের হাতে তাঁর জমি তুলে দিয়ে গেছেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছে মৈত্রেয়ী গুরুকুলমের মাধ্যমে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Ori Plast

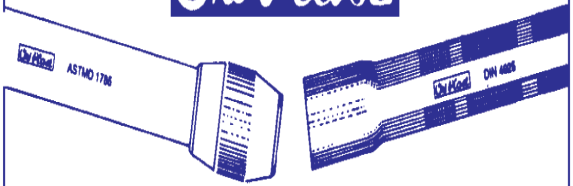

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"সন্ন্যাসী যেমন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে ব্রতী, তেমনই শিল্পীকে তার শিল্পকর্মে গভীরভাবে মনোযোগী হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত যখন যে কাজ হাতে আছে, সেটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করা। কাজের সময় সমগ্র দৃষ্টি থাকবে, যে কাজ করছি তার উপর, ফলের উপর নয়। বাইরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রোগের লক্ষণ যখন নখেই

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

শুধুমাত্র সুস্থ থাকলেই ত্বক ও চুল ভাল থাকবে, তা সেই কবেকার কথা। আবার উলটোটাও ঠিক। অর্থাৎ আপনার চুল এবং ত্বকই বলে দেবে শরীরে ঠিক কোন জিনিসটির ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে আপনার নখও কিন্তু জানান দেয় শরীরের ভেতরকার যন্ত্রগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। যেমন—

সাদা নখ : অনেকেই মনে করেন নখের কিনারা সাদা হওয়া মানে শরীরে জিঙ্ক বা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি। ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়। নখে সামান্য চোট বা আঘাত লাগলে কিনারা সাদা হয়ে যেতে পারে। এছাড়া নখের প্লেট বাড়ার ফলেও নখের কিনারা সাদাটে হতে পারে।

কী করা উচিত : পুরো নখটাই সাদা হয়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি। লিভার বা কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটাও জরুরি। লিভার বা কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে এরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাদা নখ ডায়াবেটিস, সিরোসিস বা হৃদরোগ সম্পর্কে আগাম জানান দেয়।

নখে হলুদ ছোপ : এটি ফাংগাল ইনফেকশনের ফল। তবে কারও শ্বাসকষ্ট থাকলে নখে হলুদ ছোপ দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও এই লক্ষণ থাইরয়েড সম্পর্কে আগাম জানান দিয়ে রাখে। মেয়েদের সবসময় নেইল পালিশ করে থাকাটাও কাজের কথা নয়। এতে অনেক সময় নখ হলুদ হয়ে যায়।

কী করা উচিত : নখে হলুদ ছোপ দেখা গেলে অন্তত এক সপ্তাহ নখে নেইল পালিশ লাগাবেন না। ধূমপানের নখ লেবুর রসে ভিজিয়ে রাখুন। এতে নখের হলুদ ভাব দূর হবে। আর যদি দেখেন

ফাংগাল ইনফেকশনই নখ হলুদ হওয়ার কারণ, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নীলাভ নখ : রক্তের লোহিত কণিকায় অক্সিজেনের অভাব হলে নখ নীলাভ হয়ে যায়। খুব ঠাণ্ডা পড়লে এরকম হতে পারে। রক্ত জালিকায় কোনও কারণে বাধা সৃষ্টি হলে লোহিত রক্তকণিকায় অক্সিজেনের অভাব ঘটে। আবার অনেকসময় রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অস্বাভাবিক হয়ে গেলেও নখ নীলাভ হয়।

কী করা উচিত : খুব ঠাণ্ডা লাগার ফলে নখ নীলাভ হয়ে গেলে গরম জামাকাপড় পড়ুন। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন, এতে রক্ত চলাচল ভাল হয়।

ফ্যাকাশে নখ : অ্যানিমিয়া কিংবা শরীরে পুষ্টির অভাবজনিত কারণে নখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আবার থাইরয়েড হলেও এরকম হতে পারে।

কী করা উচিত : এরকম হলে খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিন। চিনি বা শর্করা জাতীয় খাবার যতই কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। নিয়মিত দই খান।

ফোলা নখ : অনেক সময় নখ চামচের মতো ফুলে যায়। ব্যথা না থাকলেও দেখতে বেশ খারাপ লাগে।

কী করা উচিত : লিভারে কোনো সমস্যা হলে নখ ফুলে যেতে পারে। এই নখ ফুললে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

নখ ভেঙে যাওয়া : কোনো চোট বা আঘাত ছাড়াই অনেক সময় নখ ভেঙে যায়। খুব বেশি জল ঘাটলে বা কাচাকাচি করলে ডিটারজেন্টের প্রভাবে নখ ক্ষয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর একটা সময় ভেঙে যায়। শরীরে পুষ্টির ঘাটতি বা ফাংগাল ইনফেকশনের কারণেও এরকম হতে পারে।

কী করা উচিত : জল কম ঘাঁটলেই ভাল। জলের কাজ করতে হলে গ্লাভস্ ব্যবহার করুন। রাতে শোয়ার আগে নখে ময়শ্চারাইজার লাগান। এসব সমস্যার সমাধানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। ∎

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির 'পরিচিতি' বর্গ

গত ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি বীরভূম জেলার সমিতি পরিচিত বর্গ হয় বাবুইজোড় সরস্বতী শিশু মন্দিরে। পরিচিতি বর্গে ৫টি গ্রাম থেকে ৪০ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করে। অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর বর্গে উপস্থিত থেকে শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিষয় পরিচালনা করেন। এছাড়াও প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ রেখা পাল, বাবুইজোড় সমিতির কার্যবাহিকা কবিতা কর্মকার, সহ- কার্যবাহিকা তিথি মুখোপাধ্যায় এবং সিউড়ির কার্যকর্ত্রী মৌসুমী মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে সংকল্প শিবির

দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিরন্তর কাজ করার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেকটাই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শিব জ্ঞানে জীব সেবার আদর্শকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে জীবনের ধ্রুবতারা করে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত সঙ্ঘ সমাজের সর্বত্র পৌঁছতে চায়। সেই লক্ষ্য নিয়ে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় সংকল্প শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গের ১০টি জেলায় তিন দিনের সংকল্প শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনে উত্তরবঙ্গে একটি বড় যুব শিবির করার লক্ষ্য নিয়ে এইসব শিবিরগুলিতে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তরবঙ্গের সব খণ্ড এবং আধিকাধিক মণ্ডল থেকে ১০ টি জেলার মোট ৫৪৬২ জন স্বয়ংসেবক প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে তিন দিনের শিবিরে শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। জেলা অনুসারে সংকল্প শিবিরের সংখ্যা— শিলিগুড়ি ৩০০, জলপাইগুড়ি ২৩০, আলিপুরদুয়ার ৩১২, পশ্চিম কুচবিহার ৬২০, কোচবিহার ১০৮৪, উত্তর দিনাজপুর ৮৩৪, দক্ষিণ দিনাজপুর ৬০৫, মালদা ১১১৭, উত্তর মুর্শিদাবাদ ১৪৫, উত্তর মালদা ২১৫। এই সংকল্প শিবিরগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেশি সংখ্যায় উপস্থিত সকলের নজর কেড়েছিল। নিজের খরচে গণবেশে প্রতিটি সংকল্প শিবিরে স্বয়ংসেবকরা পথসঞ্চালনে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরগুলিতে উদ্বোধন, বৌদ্ধিক এবং সমাপ্তি কার্যক্রমে ক্ষেত্র, প্রান্ত জেলার কার্যকর্তাগণের আগমন ঘটেছিল। পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, সহক্ষেত্র কার্যবাহ গোপাল প্রসাদ মহাপাত্র, ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ প্রমুখ অসীম মিত্র এবং অসম ক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারক গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী যেমন শিবারগুলিতে এসেছেন তেমন প্রান্তের সব কার্যকর্তাই কোনো না কোনো শিবিরে থেকে স্বয়ংসেবকদের উৎসাহিত করেছেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী নতুন পুরাতন স্বয়ংসেবকরা আনন্দের সঙ্গে আগামীদিনে সঙ্ঘের কাজ করার প্রেরণা পেয়েছেন। মালদা শিবিরে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক তথা সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত গত ২৮ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন— 'হিন্দুধর্ম' হিন্দু সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হলে ভারতবর্ষের অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে পড়ে। হিন্দুত্ব একটি দর্শন, একটি সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের মাটিতেই উদ্ভব এবং বিস্তার। এটিই ভারতের মূল। সকল ভারতীয়ই হিন্দু; উপাসনাপদ্ধতি, ধর্মাচরণ যাই হোক না কেন। ভারতের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করিমভাই চাগলা বলেছেন যে, তিনি সংস্কৃতিগত ভাবে হিন্দু, উপাসনাপদ্ধতিতে ইসলাম। একই কথা বলেছেন পাকিস্তান দাবির এক উত্থাপক মহম্মদ ইকবাল— সারে জঁহা সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা... হিন্দী হ্যাম হম— এখানে হিন্দী মানে তিনি 'হিন্দু' বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের সবাইকে হিন্দীভাষী বলেননি।"

উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহক্ষেত্র কার্যবাহ অধ্যাপক গোপালপ্রসাদ মহাপাত্র, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণকুমার পণ্ডিত এবং শিবির কার্যবাহ রাজু কর্মকার।

শ্রী সেনগুপ্ত আরও বলেন, তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা হিন্দুত্বের বিরোধিতা করছে, বদনাম করছে। তাদেরকে যোগ্য জবাব দিতে হবে। সর্বত্রই হিন্দুত্ব আক্রান্ত। ভারতের দুইদিকে দুই দেশ এদেশে ইসলামী মৌলবাদকে ভারত-বিরোধিতায় সহযোগিতা করে চলেছে। ■

শান্তিপুরে সংস্কৃত সম্মেলন

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ মঙ্গলবার শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম বিশাল সংস্কৃত সম্মেলন। আয়োজক সংস্কৃত সম্মেলন সমিতি, নদীয়া জেলা। পাবলিক হল ছিল সংস্কৃতপ্রেমীদের ভিড়ে পূর্ণ। স্থানীয় সংস্কৃতভারতীর ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষায় গীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে সংস্কৃত সম্মেলনকে দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাণাঘাট কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহন্ত শাশ্বত দাস মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সাধন কুমার মজুমদার। সম্মেলনের প্রধানবক্তা সংস্কৃত ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। সম্মেলন পরিচালনা করেন সম্মেলন সমিতির সম্পাদক বিকাশ মণ্ডল।

কল্যাণ আশ্রম শিবপুর সমিতির উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম হাওড়া মহানগরের শিবপুর সমিতির উদ্যোগে গত ২০, ২১ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার রাওতোরা ও পশ্চিমমেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়িতে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন রাওতোরায় ৪০০ গ্রামবাসী ও দ্বিতীয়দিন বেলপাহাড়িতে ৩০০ গ্রামবাসী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। ৬ জন চিকিৎসকের মধ্যে ৩ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শিবিরে সবাইকে বিনামূল্যে ওষুধ ও বেশ কয়েকজনকে চশমা দেওয়া হয়। শিবিরে নেতৃত্ব দিয়েছেন শিবপুর সমিতির নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও কাঞ্চন ভট্টাচার্য।

মঙ্গলনিধি

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক সুধাংশু মিশ্র তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে ধর্মরক্ষা নিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহ-নিধি প্রমুখ ধর্মেন্দ্র ভালোটিয়া, প্রান্ত পরিযোজনা প্রমুখ সুশীল কুমার দলুই ও প্রান্ত প্রমুখ সনাতন মাহাতো।

***

গত ৯ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত শুশ্রুত শাখার স্বয়ংসেবক ডাঃ আশিস মজুমদার তার পুত্রের বধূবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজের সেবাকাজের জন্য মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। সহ বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষচন্দ্র নন্দী তাঁর বক্তব্যে নিমন্ত্রিত পরিবার ও অতিথি অভ্যাগতরা অনুপ্রাণিত ও সমর্পণে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

শোকসংবাদ

ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক দেবপ্রসাদ ঘোষের পিতৃদেব গোপাল চন্দ্র ঘোষ গত বুধবার ২৪ ডিসেম্বর রাতে হাওড়া জেলার মাকড়দহ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। স্বর্গীয় গোপালবাবুর পরিবার সঙ্ঘময়। তাঁর তিন নাতিও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

***

ডোমজুড় শাখার স্বয়ংসেবক তথা ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের হাওড়া জেলা সংযোজক সনৎ কুমার দাসের কাকিমা মালতী দাস ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা এবং নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

বর্ধমান জেলার বর্ধমান নগরের স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় দত্তের মাতৃদেবী আরতি দত্ত ৭২ বছর বয়সে গত ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ২ পুত্র, ১ পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ, তিনি নিজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। তাঁর পুত্রবধূও দুর্গাবাহিনীর দায়িত্বে আছেন।

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions,
unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

ক্রীড়াজগতেরও প্রেরণাশক্তি বিবেকানন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

না ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার তলায় টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষা করছেন। ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করছেন : 'মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক বৈরাগ্য দাও'। ইনি সেই বিবেকানন্দও নন যিনি শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা করতে উঠে বলেন— 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'। ইনি সেই বিবেকানন্দ— যিনি প্রথম জীবনে শক্তিমান ক্রীড়াবিদ তথা শরীরচর্চার মূর্ত প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিভাত করেছিলেন। এই বিবেকানন্দ আশৈশব ক্রীড়ানুরাগী এবং ক্রীড়ামনস্ক জীবনজয়ী পুরুষ, যিনি প্রথম জীবনে আখড়ায় গিয়ে কুস্তি লড়েছেন রীতিমতো গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে। কলকাতা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছেন। সাঁতার, জিমনাস্টিক্স করেছেন এমনকী বিদেশের মাটিতে শুটিং, গলফেও অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনিই তো বলেছিলেন 'আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের উপনিষদ যতই বড় হোক, অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হোন, আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে বলছি— আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য —এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ।' তাই তিনি ভারতীয় যুবকদের আহ্বান করেছিলেন এই বলে যে তোমরা সবল হও। শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার মাধ্যম খেলা ও শরীরচর্চা। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধূলাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে তাই খেলা, শরীরচর্চার ওপর এত জোর দেওয়া হয়। তিনি নিজেই যে সব খেলার এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন।

শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত বিবেকানন্দের দেহ-মন গড়ে ওঠার ভিত্তি ছিল বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর যতীন্দ্রনাথ (গোবরবাবু) গুহর আখড়া। নিয়ম করে ব্যায়াম, সব রকমের প্রকরণগত শরীরচর্চা করতেন। যেতেন নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায়। সেখানে ব্যায়াম, অসি চালানো, লাঠিখেলা, কুস্তি, বক্সিং সবকিছু অভ্যাস করেছিলেন। আমেরিকা পরিভ্রমণকালে একবার গলফের স্টিক হাতে বিবেকানন্দ এমন কাণ্ড করেছিলেন যে, জনৈক আমেরিকান ভক্ত বলে উঠেছিলেন 'এটা শুধু ক্রীড়াদক্ষতা নয়, এ হল ভারতীয় যোগ বিভূতির অপার মহিমা।' কথাটা শুনে স্বামীজী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন 'এ সমস্ত সামান্য ব্যাপারে ভারতীয়রা যোগবিদ্যার প্রয়োগ ঘটায় না।' আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থানকালে স্বামীজির যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানভঙ্গি দেখে পাশ্চাত্যের মানুষ উপলব্ধি করেন ভারতীয় যোগের মহিমা।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পূর্ণপ্রভায় বিশ্বসমাজকে আলোকিত করে রেখেছেন, তখন ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের নবজাগরণ। অলিম্পিকের মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, মানবতার সঙ্গে স্বামীজীর জীবন বেদ- বেদান্ত-দর্শনের সার্বিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিয়াডের সঙ্গে বিশ্বমেলাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেখানে গিয়েছিলেন এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করেছিলেন অলিম্পিকের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য। বহু বক্তৃতা করেছিলেন। ফিরে এসে প্রবন্ধ, নিবন্ধও লিখেছিলেন যা ভারতীয় ক্রীড়াজগতে প্রেরণা ও শক্তির আঁধার স্বরূপ হয়ে আছে।

তাঁর বাণী ও অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে এদেশের ক্রীড়াজগতে বহু গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক রচিত হয়েছে। যেমন ১৯১১-র সেই ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের গৌরবময় অধ্যায় তৈরি করা। পরপর ম্যাচে শক্তিশালী বৃটিশ সামরিক দলগুলিকে হারিয়ে মোহনবাগানের শিল্ড জয় এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাড়তি উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বাংলার বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই জয় থেকে। পরে ভারতীয় হকি দলে 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' অর্থাৎ বিশ্বমঞ্চে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারও চালিকাশক্তি ছিল বিবেকানন্দের ওজস্বী বাণীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। স্বাধীনতার পর দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের সাফল্যের প্রেক্ষিতেও তাঁর অভীমন্ত্র অর্থাৎ লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত প্রচেষ্টা, লড়াই থামিও না। নিষ্ঠা, পরিশ্রম, আবেগ, সংকল্প মিলে সাফল্যের উজ্জ্বল বৃত্ত রচনা করা সম্ভব। সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর প্রণীত নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হয়ে উঠতে পারে, তবে তাঁর স্বদেশে এত সম্পদ ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কেন ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে বৃহৎ ক্রীড়াশক্তি হয়ে উঠবে না? তাই বিবেকানন্দের স্বপ্ন— এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। অর্থাৎ অতীতের যাবতীয় গৌরব গরিমায় পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বক্রীড়াবৃত্তে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। তা করতে হলে বিবেকানন্দই প্রকৃত 'স্টেপিংস্টোন'।

শব্দরূপ-৭৩৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	■	■	■	১		২
■	৩		৪	■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■	১০			■
১১			■	■	■	■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বেগুন; প্রথম দু'য়ে সমাচার, ৩. বৃহৎ-চঞ্চু পক্ষী বিশেষ; কুবের, ৬. মাঘ মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী, ৭. রাবণ-মন্দোদরীর পুত্র, মেঘনাদ, ৮. হাতির মাথার কুম্ভাকৃতি অংশ, ৯. ক্ষ্যাপা কুকুর, ১০. ধনুকের জ্যা টেনে ছেড়ে দিলে যে শব্দ হয়, ১১. সূর্যপত্নী ছায়া।

উপর-নীচ : ১. বসন্তকালে পূজিতা মহাদেবী, ২. মহাকবি কালিদাসের একখানি কাব্য, ৪. 'এসেছে—, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে', ৫. বিবাহের পূর্বে পাত্র বা পাত্রীর পিতৃগৃহে অন্নগ্রহণ সংস্কার, ৮. রাশিচক্রের চতুর্থ রাশি; ক্যান্সার রোগ, ৯. ব্যভিচারিণী, নষ্টা, কুলটা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩১

■	■	দে	বী	প	ক্ষ	■	ফু
গো	ম	য়	■	■	ণ	■	ল্ল
■	ড	■	মে	■	দা	দ	রা
■	ন	হু	ষ	■	■	গু	■
■	মি	■	■	পু	দি	না	■
আ	শ্র	ম	■	রু	■	য়	■
দি	■	ঞ্জি	■	■	নে	ক	ড়ে
ত্য	■	স	ং	স্থি	তা	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৩৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

মানব সেবা প্রতিষ্ঠান ও রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্কের উদ্যোগে

দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের কুম্ভ সম্মেলন

স্থান : গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন
২২ জানুয়ারি, ২০১৫, সকাল ১২ টায় উদ্বোধন

বিকাল ৪টায় উপস্থিত থাকবেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, অনাথ আশ্রম, হোমিও চিকিৎসালয়, গো-শালা।

মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রী গোপাল ঝুনঝুনওয়ালা কর্তৃক প্রচারিত

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ১১

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
12 January - 2015

বনবাসী ক্ষেত্রে শিক্ষা, সংস্কার এবং আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যে

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী রামসুখদাসজীর প্রেরণায় ১০৮ বনবাসী কথাকারের দ্বারা

।। শ্রীরামচরিতমানস নবাহ্ন পারায়ণ জ্ঞানযজ্ঞ ।।

সম্মিলিত পাঠ

৮ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫
দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
চিত্রকূট ধাম (শহীদ মিনার ময়দান), কলকাতা

পুণ্য উপস্থিতি :

বৃন্দাবন থেকে সন্ত নওলরামজী এবং ব্রহ্মচারী শক্তিরামজী মহারাজের মুখ নিঃসৃত প্রবচন

আপনাকে সপরিবার ও সবান্ধবে সাদর আমন্ত্রণ জানাই

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, কলকাতা